ফতওয়া
গুরুত্ব
প্রয়োজন

ইসলামিক ল রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ফতওয়া
গুরুত্ব
প্রয়োজন

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ফতওয়া
গুরুত্ব
প্রয়োজন

Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World.
আল-মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যা (ফিক্হ বিশ্বকোষ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুয়েত।
ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ই.ল.রি.সে. প্রকাশনা-৫

ফতওয়া গুরুত্ব প্রয়োজন

(তিনটি বিশ্বকোষ থেকে তিনটি গবেষণামূলক নিবন্ধ)

প্রকাশক

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

(সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট)

সেক্রেটারি জেনারেল

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

৩৮০/বি, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

ফোন : ৯১৩১৭০৫

প্রথম প্রকাশ

যিলহজ্ব : ১৪২১

চৈত্র : ১৪০৭

মার্চ : ২০০১

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার কার্যালয়

❑ আধুনিক প্রকাশনী

বাংলাবাজার ও বড় মগবাজার

❑ আহসান পাবলিকেশন্স

বাংলাবাজার ও কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স

মূল্য : [redacted]মূল্য-১০০/=

Fatwa Importance Necessity, published by Muhammad Nazrul Islam, Secretary General, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh.

Price : Tk. 50.00 only, US Dollar : 3.00 only.

প্রকাশকের কথা

বিগত কয়েক বছর থেকে একটি গোষ্ঠী আমাদের দেশে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ফতওয়া সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং এ বিষয়টা নিয়ে বেশ হৈ চৈ করে আসছে। এর পেছনে চিহ্নিত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির উস্কানী ও পরিকল্পনাও কাজ করছে। সাজানো কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে তারা যে এ সব কাজ করছে একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়ার গভীর, তাত্ত্বিক, মৌলিক ও বাস্তবভিত্তিক বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্প্রতিকালে এই বিভ্রান্তি ও হৈ চৈকে কোর্টকাছারী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের দু'জন সম্মানিত বিচারপতি উলামায়ে কেরামের ফতওয়াকে ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

তাই ফতওয়া সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ কোনো প্রকার পক্ষপাতমূলক আলোচনায় না গিয়ে নিছক তাত্ত্বিকভাবে এর স্বরূপ বিশ্লেষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এখানে এ বইটিতে দুনিয়ার তিনটি বহুল প্রচলিত ভাষার ইনসাইক্লোপিডিয়ার ফতওয়া সম্পর্কিত তিনিটি নিবন্ধ একত্র করে প্রকাশনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থিত করার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ মুসা এবং সম্পাদনায় আবদুল মান্নান তালিব আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এ জন্য আমরা তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া যারা অনুবাদ কর্মে সহযোগিতাসহ নানা কর্মে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছেও আমরা ঋণী।

আশা করি বইটি ফতওয়া সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভে আগ্রহীজনদের জ্ঞান পিপাসা মিটাতে সক্ষম হবে।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সেক্রেটারি জেনারেল
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ভূমিকা

ইসলামী শরীয়ত একটি বাস্তব ভিত্তিক ও প্রকৃতিসম্মত বিধান। জীবনের জন্যই এ বিধানের প্রয়োজন। তাই আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের জন্য নিজেই এ বিধান তৈরি করেছেন। মানুষের পক্ষ থেকে এ বিধান চাওয়া এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ বিধান বর্ণনা করাকে কুরআনে 'ইসতিফ্তাহ' ও 'ফতওয়া' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (আন নিসা : ১২৭)

তাছাড়া ইসলাম একটি প্রায়োগিক জীবন বিধান। জীবনের সব ক্ষেত্রে এ বিধানকে প্রয়োগ করার জন্যই পাঠানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ বিধান প্রয়োগ করার জন্য আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন। পরবর্তীকালে উম্মতের মধ্যে এরই ভিত্তিতে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শরীয়তের বিধান সুস্পষ্ট করার জন্য ফতওয়ার সিলসিলা জারী হয়, যা আজও অব্যাহত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে 'ইলম' তথা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক যথার্থ জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ সরাসরি 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদের মৃত্যু দানের মাধ্যমে 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলেম থাকবে না তখন লোকেরা অজ্ঞদেরকে তাদের নেতা বানাবে। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে এবং তারা ইলম ছাড়া ফতওয়া দেবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।' (মুসলিম কিতাবুল ইলম)

ইসলামী নিযামকে সচল ও সজীব রাখার জন্য মূলত এ ফতওয়া দেবার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। তবে এ ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সব সময় মুসলমানদের হাতে থাকা এবং তাও শরয়ী জ্ঞানে পারদর্শী মুসলমানদের হাতে থাকা সম্ভবপর নাও হতে পারে। কিন্তু সব দেশে ও সব যুগে মুসলমানদের ইসলামের শরয়ী বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি শরয়ী জ্ঞানে পারদর্শী আলেমদের ওপরই এ দায়িত্ব বর্তেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় তাদেরকে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। ফতওয়া দান মূলত মুফতি ও মুজতাহিদদের কাজ। আল্লাহ্র শোকর এ কাজ তারা আজও অব্যাহত রেখেছেন। কোনো জালেম শাসকের রক্তচক্ষু তাদের এ দায়িত্ব পালনে বিরত রাখতে পারেনি।

বর্তমানে একটি মহল আমাদের দেশে ইসলামী শরীয়তের এই মহত ও বিশাল ইনস্টিটিউশন 'ফতওয়ার' বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়ে আসলে ইসলামী শরীয়তকেই আহত ও বিনাশ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এতে সন্দেহ নেই। এর ওপর বলা যায় বিগত কয়েকশ' বছর থেকে কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে মুসলমানদের জীবন যাপন করতে হয়েছে এবং বর্তমানে অর্ধ শতক থেকে যেসব মুসলমান মুসলমানদের শাসন করে আসছে তারা ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী বিধানকে তাদের পায়ের ভৃত্যে পরিণত করে রেখেছে। তারা তাদের প্রপাগান্ডা মিডিয়াগুলির সাহায্যে ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়াবার ক্ষেত্রে কোন কসরত বাকী রাখেনি। এ অবস্থায় ফতওয়ার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শরীয়ার অপরিহার্য ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রপাগান্ডা সাধারণ সচেতন মুসলমান ও মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজকেও বিভ্রান্তির সাগরে নিক্ষেপ করলে অবাক হবার কিছু নেই।

তাই সচেতন মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিমুক্ত এবং ইসলামী শরীয়ার দুর্বার ক্ষমতা এবং সুসংগঠিত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিরোধী পক্ষকে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে আরবী, ইংরেজি ও বাংলা তিনটি বিশ্বকোষ থেকে ফতওয়া সম্পর্কিত তিনটি জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ এখানে সন্নিবেশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করি ফতওয়া সম্পর্কে এই একান্ত একাডেমিক আলোচনা এতদসম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ার বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিভ্রান্তি দূর করে তিনি ইসলামী নিযামকে আবার বিকশিত হবার সুযোগ দান করবেন। এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

আবদুল মান্নান তালিব

সূচিপত্র

ফতওয়া ও তার প্রয়োজনীয়তা

ফতওয়া সম্পর্কে ধারণা

ফতওয়ার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ পরিভাষাটি সম্পর্কে তিনটি পৃথক ধারণা বিদ্যমান ঃ সাধারণভাবে ইসলাম ধর্মের তথ্য অনুশাসন, আইন-আদালতকে পরামর্শ প্রদান এবং ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিকভাবে প্রথম ধারণাটিই প্রধান এবং আধুনিক কালে তা আরো গুরুত্ব নিয়ে বিকশিত হয়েছে যা আধুনিক ফতওয়ার সংকলনে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ ও বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয়। "ফতওয়া দারুল-উলুম দেওবন্দ" (দেওবন্দ ১৯৬২ খৃ.) গ্রন্থে ১৮৬৭ সালে ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদরাসার মুফতীগণ ফতওয়া-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ ফতওয়া হচ্ছে "আইন ও ধর্ম থেকে উদ্ভূত কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের স্বব্যাখ্যাত জবাব"। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফতওয়ার ধারণাটি কিভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছে তার পর্যালোচনা ব্যতীত আধুনিক যুগে বিষয়টির ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

আক্ষরিক অর্থে দেখা যায় যে, 'ফতওয়া' শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে 'ফাতা' থেকে, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'তারুণ্য, নতুনত্ব, স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা'। এ সকল গূঢ়ার্থ বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

পরিভাষা হিসেবে এর উৎপত্তি ঘটেছে আল-কুরআন থেকে, যেখানে শব্দটি দুই স্থানে ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার অর্থ হচ্ছে 'সুনির্দিষ্ট জবাব চাওয়া' এবং 'সুনির্দিষ্ট জবাব প্রদান' (দ্র. ৪ঃ ১২৭, ১৭৬)।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'ফতওয়া'-র বিষয়টি বিকাশ লাভ করে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এর বিষয় ছিল বিশেষায়িত কোন শাখা ব্যতীত সাধারণ জ্ঞান (ইলম)। পরবর্তী কালে 'ইলম' যখন 'হাদীস'-এর সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে পরিচিতি লাভ করে, 'ফতওয়া' তখন 'রায়' (মতামত) ও 'ফিক্‌হ' (আইনশাস্ত্র বা আইন)-এর সাথে সংযুক্ত হয়। বিভিন্ন মাযহাবের আলেমগণ কর্তৃক আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাদি সংকলনের পরে পরিভাষাটির প্রয়োগিক অর্থ আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয় যে, 'ফতওয়া' হচ্ছে সে সকল বিষয় যা 'ফিক্‌হ' (আইন) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নেই।

ইসলামী সাহিত্যে 'ফতওয়া' সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিভিন্ন বৈসাদৃশ্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসৃত হলেও তাতে ফতওয়া সম্পর্কে বিভিন্নভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 'বিষয়বস্তু'র পরিধি বিবেচনায় 'ফতওয়া' ইসলামী আইনের মূল গ্রন্থাদির (মুতুন)-এর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। ফতওয়ার

পরিধি হচ্ছে ব্যাপকতর এবং এতে রয়েছে আইনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মমত সংক্রান্ত সেই সকল বিষয়াদি যা ফিক্‌হ গ্রন্থাবলীতে স্থান পায়নি। এভাবে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংজ্ঞায়িত প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী আইনের পরিধির চেয়েও ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ব্যাপকতর বিষয়াদি ফতওয়ায় স্থান পেয়েছে। বিচারিক কর্তৃত্ব, বিচারের আওতা ও প্রায়োগিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ফতওয়াকে 'কাদা' বা আদালতের রায়ের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। ফতওয়ার পরিধি 'কাদা'-এর চেয়ে প্রশস্ততর; যেমন-'ইবাদত'-কে আদালতের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে, যদিও তা ইসলামী আইনের অপরিহার্য অংশ এবং 'ফিক্‌হ' ও 'ফতওয়া'-র গ্রন্থাবলীতে ইবাদতকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'কাদা' হচ্ছে বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োগযোগ্য, কিন্তু 'ফতওয়া' সেরূপ নয়। সুতরাং ফতওয়াকে বলা যায়, আদালতে ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিক আইনের ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করার পরোক্ষ ব্যবস্থা। নৈতিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে ফতওয়া 'তাকওয়া' বা ধার্মিকতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি বিষয় অনুমতি দেয়া না দেয়ার প্রশ্নে 'উদার' (রুখসাত) বা 'কঠোর' (আজীমাত)-এর দুই দৃষ্টিভংগির মধ্যে ফতওয়া যে কোন একটির অনুমতি দিতে পারে অথবা আইনের কঠোর বাধ্যবাধকতার বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা (হীলাহ) অবলম্বন করতে পারে; কিন্তু 'তাকওয়া' এরূপ কৌশলকে অনুমোদন নাও করতে পারে। শেষোক্ত বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি বিভিন্ন সাহিত্যে ও সূফী মতবাদের রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে।

'ফতওয়া' বিচার ব্যবস্থার বাইরে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে, যদিও কতিপয় ব্যবস্থায় 'মুফতীগণ' সরকারীভাবেই আদালতের সাথে সংযুক্ত থাকেন। আন্দালুসিয়ার আদালতে মুফতীগণ বসেন 'মুশাওয়ির' (আইনগত পরামর্শদাতা) হিসেবে এবং বৃটিশ ভারতে গোড়ার দিকে তারা আদালতে উপস্থিত থাকতেন 'মৌলভী' (বিজ্ঞজন) হিসেবে। আইনবিশারদগণ বিচারকদের সুবিধার্থে বিশেষ কোন মতাবলম্বীদের মতবাদ, সর্বসম্মত মত ও প্রামাণিক সূত্রাবলীর সংযোজনসহ ফতওয়া গ্রন্থ সংকলন করেন।

কোন মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুফতীগণের মর্যাদার বিষয়টি সে সমাজে 'ফিক্‌হ'-এর স্থান ও ভূমিকা কতটুকু তার উপর নির্ভর করে। আন্দালুসিয়ায় জুরীরা ছিলেন ক্ষমতাবান। তারা ছিলেন আমীর ও খলীফাদের পরামর্শ সভার (শূরা) অংশবিশেষ। উসমানী ও মুঘল রাজনৈতিক পদ্ধতিতে প্রধান মুফতীকে বলা হতো 'শায়খুল-ইসলাম'। এছাড়া মুফতীগণকে বাজার পরিদর্শক, জন-নৈতিকতার অভিভাবক এবং ধর্মীয় বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হতো।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে মাদরাসাগুলো মুফতীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাদরাসাগুলো 'দারুল ইফতা' নামক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ যে স্থান থেকে ফতওয়া দেয়া হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রকাশনা ও ইলেকট্রোনিক মাধ্যমগুলো ফতওয়ার ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। মুফতীগণ সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানারকম পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছেন। ফতওয়ার পরিধি এখন শুধু সম্প্রসারিতই হয়নি, বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এখন তা তাৎক্ষণিক সহজলভ্য বিধায় তার ভাষা, উপস্থাপনা ও কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে।

ফতওয়ার আদর্শিক কর্তৃক ব্যতিক্রমহীনভাবে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, আইনপ্রণেতো মহানবী (স)-এর উত্তরসুরি ও প্রতিনিধি হচ্ছেন একজন মুফতী। একজন মুফতীর বিধিগত কর্তৃত্ব 'তাকলীদ' মতবাদ থেকে উৎসারিত হয়েছে। 'তাকলীদ' হচ্ছে ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আস্থা। এর দাবি হচ্ছে আলেমদের সাথে পরামর্শ করা; এজন্য কখনো কখনো বিশেষ কোন মাযহাবের আলেমদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামতও গ্রহণ করা। যখন একজন মুফতীকে তার মতামতের পক্ষে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিতে হয়, তখন তার সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তিগত নয়। এ কারণেই একজন মুফতীর যোগ্যতা এবং ফতওয়া প্রদানের বিধি-বিধান গুরুত্বের সাথে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। যিনি জানতে চান (মুস্তাফী) তার উচিত হবে একজন মুফতীর মতামত গ্রহণ ও মান্য করা, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, তিনি ফতওয়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত এবং তার মতামত পূর্বেকার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে একজন মুফতীকে অবশ্যই 'মুজতাহিদ' হতে হবে (অর্থাৎ বিধি-বিধান ও যুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে যিনি আইনশাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবার যোগ্যতা রাখেন)। অবশ্য একজন 'মুকাল্লিদ'ও (কোন মাযহাবের অনুগামী) ফতওয়া দিতে পারেন যদি তিনি তার উদ্ধৃতির সূত্র উল্লেখ করেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ সাধারণত ফতওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ফতওয়া হচ্ছে ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আইনগত মতামত প্রদান। এমিল তাওইয়ান (১৯৬০ খৃ., পৃ. ২১৯) মনে করেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে এজন্য যে, ইসলামে আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা ছিলো না। তিনি মুসলিম রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুফতীর ভূমিকাকে দেখেছেন পরামর্শ (শূরা) ও আইন প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে।

আধুনিক কালে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ফতওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরূপ সংস্থা রাষ্ট্রকে পরামর্শ প্রদান করে এবং ফতওয়া জারী করে থাকে, যেমন পাকিস্তানের "কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডোলজী" অথবা সৌদি আরবের

'হায়আ কেবার আল-উলামা'। ঐসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হচ্ছে উপদেষ্টামূলক এবং তা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশবিশেষ; বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন নয়। 'ফতওয়ার' বর্তমান বিকাশের ধারাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে ফতওয়াকে বিবেচনা করতে হবে ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ তথ্যের কার্যক্রম হিসেবে।

প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী

কোন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একজন মুফতী যখন জবাবের আকারে কোন ফতওয়া প্রদান করেন, সেটি শরীয়ার ব্যাখ্যা সম্বলিত মতামত হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত স্থান-কাল ভেদে মুসলিম সমাজে ফতওয়া প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। আর এ প্রতিষ্ঠানটি আইনের নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতা ও স্থানীয় আচার-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধকরণে মৌলিক অবদান রেখে আসছে। আইনগত বিশেষত্বের শ্রেণীবিভাগ হিসেবে ফতওয়ার পরিচিতি বিচার প্রণালীর চাইতে কম। ফতওয়া হচ্ছে রোমান জুরী ও ইহুদী পণ্ডিতদের মতামত দান প্রক্রিয়ার অনুরূপ একটি ব্যবস্থা। মুসলিম কাযীদের প্রদত্ত আদালতের রায়ের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ফতওয়ার একটি সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব রয়েছে। পরিভাষাগত মানের বিচারে আদালতের 'রায়' হচ্ছে 'সৃজনশীল' বা পরিকৃতিমূলক কাজ; অপরদিকে ফতওয়া হচ্ছে তথ্যমূলক বা যোগাযোগমূলক কাজ।

আদালতের রায় হচ্ছে বাধ্যতামূলক ও প্রয়োগযোগ্য; অন্যদিকে মুফতীর ফতওয়া হচ্ছে উপদেশমূলক। শরীয়া আদালতের কোন সিদ্ধান্ত যদি কোন নজীর/ সূত্রের উল্লেখ ব্যতীত প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রায়ের বৈধতার বিষয়টি কেবলমাত্র উক্ত মামলার সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পক্ষান্তরে ফতওয়ার বিষয়টি সাধারণভাবে একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। আদালতের রায় আদালতের রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে জারী হয়, কিন্তু তা অন্যভাবে প্রকাশিত বা প্রতিবেদিত হতে পারে না। অপরদিকে মুফতীগণ 'ফতওয়া' সংগ্রহ, বিতরণ ও উদ্ধৃতি দেয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্ব রাখেন।

বিচারকগণ হচ্ছেন সরকারী পর্যায়ের লোক, রাষ্ট্র কর্তৃক তারা নিযুক্ত হন এবং বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। অপরদিকে মুফতীগণ হচ্ছেন বেসরকারী পর্যায়ের পণ্ডিত ব্যক্তি। অবশ্য উসমানী সাম্রাজ্যসহ আরো কিছু ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, মুফতীগণ সরকারী লোক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতিরাষ্ট্রের আইন সভার মত প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভের পূর্বে শরীয়া আইন প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্রে মুফতীগণ আদালতের বিচারকদের পরিপূরক ভূমিকা পালন করতেন এবং বহু ক্ষেত্রে মুফতী ও বিচারকদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল। অবশ্য তাদের পরস্পরের ভূমিকা ছিল সুস্পষ্টভাবেই পৃথক ধরনের। বিচারকগণ বিরোধী পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ

করেন এবং বিপক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন, অতঃপরে রায় প্রদান করেন। অপরদিকে ফতওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যাসহ মতামত বিনিময় করা হয়। মুফতীগণ জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন এবং সাধারণত জনগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই প্রশ্ন করে থাকেন। আদালতের বিচারকগণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহে তদন্তকারীর ন্যায় ভূমিকা পালন করেন। অপরদিকে একজন মুফতী উত্থাপিত প্রশ্নের ভিত্তিতে ঘটনার আপেক্ষিক অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে মতামত দেন। বিচারক ও মুফতী উভয়ই শরীয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রমে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন বিচারকের ব্যাখ্যামূলক কাজের লক্ষ্য থাকে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা দেখা। যেমন সাক্ষ্য প্রদান, স্বীকারোক্তি ও শপথ গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু একজন মুফতী অনুসন্ধান করেন আল-কুরআন ও সুন্নাহসহ আইনের মূল সূত্রগুলোর নির্দেশনাসমূহ।

মুফতীগণ নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্টতার সূত্রে পরিচিতি লাভ করেন। যেমন আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাব যা আবার শিয়া ও সুন্নী হিসেবে বিভক্ত। আবার কখনো বিশেষ কোন নির্দেশনামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির সাথে তারা সম্পৃক্ত থাকেন, যেমন ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ বা কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য বিশেষ করে বিংশ শতকে অনেক মুফতী এ সকল ব্যাখ্যাদানকারী গতানুগতিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে স্বাধীনভাবে মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা নিচ্ছেন। এর আগে 'মুফতী' বিষয়ক বিশেষ নিবন্ধে ('আদাব আল-মুফতী') মুফতী হওয়ার যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুফতীগণকে বলা হয়, 'শ্রেষ্ঠতম' বা 'স্বাধীন' ব্যাখ্যাকার। নীতিগতভাবে মুফতীগণ অন্যান্য জুরীদের মতামত বা বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভংগি অনুসরণ করেন না। বরং তারা আল-কুরআন ও মহানবী (স)-এর সুন্নাহ্‌র মত মৌলিক উৎস অনুসরণে ব্যক্তিগত ও স্বাধীনভাবে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুফতীগণ ব্যতীত রয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ের অনুগত বা 'সংযুক্ত' মুফতীগণ। এ ধরনের মুফতীগণকে 'মুকাল্লিদ' পরিভাষায় আখ্যায়িত করা হয় যারা কিছুটা প্রতিষ্ঠিত মতবাদসমূহ অনুসরণ করেন। সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাসম্পন্ন মুফতীগণ সুস্পষ্টভাবে 'ইজতিহাদ' চর্চার ভিত্তিতে বা আনুষ্ঠানিক ও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'ফতওয়া' প্রদান করে থাকেন। এমনকি কোন সহজ-সরল বিষয়ের উপর যে সাধারণ মতামত দেয়া হয় তাকেও আইনগত ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

তাত্ত্বিকভাবে 'ফতওয়া' মৌখিকভাবেই জারী করা হয়। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত উসমানী সাম্রাজ্যের ফতওয়া প্রশাসনের মত প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে এটা বলা কঠিন যে, ফতওয়া জারীর ঘটনা পুনঃ পুনঃ কী হারে সংঘটিত হবে। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখিত

ফতওয়া রুটিন কাজ হিসেবে দেয়া হয় এবং ফলস্বরূপ তা সরাসরি প্রশ্নকারীদের কাছেই দেয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তার কোন দলীল সূত্রেরও হদিস থাকে না। উসমানী সাম্রাজ্যে এবং ভারতের কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণ ফতওয়ার সংকলণসমূহ আরকাইভস-এ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইয়ামানী জুরী আস-শাওকানী তার অসংরক্ষিত বিপুল সংক্ষিপ্ত ফতওয়া এবং গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত প্রধান প্রধান ফতওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মিসরের গ্রান্ড মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহ রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তার সরকারী দায়িত্বের বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সাধারণ ফতওয়া প্রদান করতেন। বিংশ শতকের মাঝামাঝি কয়েক দশক ধরে ইয়ামান প্রদেশে মুফতীগণ হাজার হাজার ফতওয়া জারী করেছেন। অবশ্য সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি বা অনুলিপি করেও রাখা হয়নি। কিন্তু সেগুলো মূল প্রশ্নসহ চিরকুটে সরাসরি প্রশ্নকারীর নিকট লিখিতভাবে হস্তান্তর করা হতো।

বিষয়বস্তুর পরিধির ক্ষেত্রে কম-বেশী পার্থক্য সত্ত্বেও সাধারণত উসমানী সাম্রাজ্যের কতিপয় সরকারী মুফতীর ব্যবহৃত ভাষা এবং ফতওয়ার সংকলন গ্রন্থে দেখা যায় যে, একক শব্দ দ্বারা ফতওয়া দেয়া হতো ('হাঁ, 'না', জায়েয ইত্যাদি)। প্রশ্নকর্তারা ছিলেন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সকল স্তরের পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের এলিট, শিক্ষাবিদ, আদালতের বিচারক, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত ফতওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। মুফতীগণ নিজেরা ছিলেন পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় পর্যায়ের পণ্ডিত, যারা বিশেষ বিশেষ সময়ে ও অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন।

অপরদিকে মুফতীগণ ছিলেন যুগের সর্বোচ্চ চিন্তা-চেতনার ব্যক্তিত্ব বা ফতওয়া ইস্যুকারী সংস্থার সর্বোচ্চ চূড়ার ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। মুফতীগণের স্তর ও প্রশ্নকারীর পর্যায়ভেদে ফতওয়ার পার্থক্য হয়ে থাকে। সাধারণভাবে উপস্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব তেমন জটিল কিছু ছিলো না। কিন্তু বিশেষ পাণ্ডিত্যের সাথে যেসব ফতওয়া দেয়া হতো সেগুলোতে গ্রন্থসূত্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকতো এবং যে যৌক্তিকতা ও পদ্ধতি অনুসারে ফতওয়া দেয়া হয়েছে তার ইঙ্গিত থাকতো।

একজন মুফতী ও একজন সাধারণ প্রশ্নকারীর মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ভর করে তাদের পরস্পরের ভূমিকার উপর। আধুনিক স্কুল কারিকুলাম ও বিশ্বজনীন জ্ঞানচর্চার উদ্ভবের পূর্বে শরীয়া সংক্রান্ত জ্ঞানই ছিল সমাজের উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। ফলস্বরূপ একদল সীমিত ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় শুধু ধর্মীয় জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের নির্ধারিত মৌলিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং বিভিন্ন ধরনের চুক্তি, লেন-দেন, আইনগত, অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামোগত বিন্যাস পর্যন্ত

তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। এরূপ সামাজিক অবকাঠামোতে যারা জ্ঞান অর্জনে সমৃদ্ধ হতেন তারাই হয়তো শিক্ষক হিসেবে নচেৎ মুফতী হিসেবে প্রচার কাজ করতেন।

অপরদিকে প্রয়োজন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকারীরা আলেমগণের কাছে শরীয়া নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতো। আদর্শ হিসেবে মুফতীগণ হতেন দৃষ্টান্তমূলক উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব, যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঔজ্জ্বল্য তাদের ব্যক্তিত্বের সাথেই শোভনীয় হতো। সামাজিকভাবে মুফতীগণকে যে সম্মান দেয়া হতো তা ছিল তাদের জন্য মর্যাদাকর ও শ্রদ্ধামূলক।

মুফতীগণ যদিও যার যার এলাকায় সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তবুও কতিপয় প্রশ্নকারী উপযুক্ত ও প্রাজ্ঞ মুফতী খুঁজে বেড়াতেন। অন্যরা অবশ্য যে সকল মুফতী সহজলভ্য থাকতেন তাদেরই কারো কাছে যেতেন। আদাব আল-মুফতী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একজন প্রশ্নকারীর উচিত হচ্ছে একজন মুফতীর জ্ঞানের পরিধি ও পাণ্ডিত্যের সুনাম-সুখ্যাতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া। কিন্তু এরূপ তথ্য সংগ্রহ করা গেলেও তা মূল্যায়ন করা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ছিল কঠিন। মূল কথা হচ্ছে একজন প্রশ্নকারী একজন উপযুক্ত ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে অথবা সম্ভাব্য মুফতীর ধার্মিকতার বিবেচনায় প্রদত্ত রায়ের প্রতি আস্থা স্থাপন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীগণ প্রথমে একজন মুফতীর মতামতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে দ্বিতীয় মুফতীর কাছে যেতেন এবং তারা হয়তো ভিন্নতর ফতওয়া দিতেন। অন্য ক্ষেত্রে কোন বিরোধের বিপক্ষ ব্যক্তি/ব্যক্তিরা অপর মুফতীর কাছে গিয়ে ভিন্নমতের ফতওয়া সংগ্রহ করতো যাতে তাদের অবস্থা শক্তিশালী হয়।

বিতর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারে মতামত বিনিময় হয়ে থাকে। প্রশ্নগুলোর ধরন বিভিন্নরূপ হলেও এতে মুসলিম সমাজের সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমৃদ্ধ তথ্যের সমাহার থাকে। ব্যাখ্যাদান প্রক্রিয়ায় প্রশ্নের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ তারা উত্থাপিত সমস্যাটির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মুফতীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিবেচনা করে থাকে। একই সময় নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা/বিষয়কে তুলে ধরার জন্য প্রশ্নগুলো উপর্যপরি সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করা হয় বা বিশেষ উত্তরের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়। যেহেতু মুফতীগণ কোন ঘটনার তদন্ত করেন না, সেহেতু প্রশ্নোক্ত বিষয় যেভাবে বর্ণনা করা হয় সেভাবেই তা বিবেচনায় নেয়া হয়। অপরদিকে বিচারকগণ কোন মামলার ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রকৃত ঘটনাকে জানার চেষ্টা করে থাকেন। একজন মুফতীকে যে প্রশ্ন করা হয় তাতে প্রদত্ত তথ্যকেই শুধু তিনি বিবেচনায় নেন। এ কারণেই ফতওয়ায় প্রদত্ত মতামত উল্লিখিত তথ্যের সীমাবদ্ধতায় দুষ্ট। অধিকন্তু উসমানী সাম্রাজ্যে মুফতীগণের কাছ থেকে

সংক্ষিপ্ত জবাব লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দ্বারা তা পুনঃলিখিত হতো। তাত্ত্বিকভাবে মুফতীগণের নিকট প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেই প্রশ্ন উত্থাপন করা সমীচীন ছিল; আনুমানিক বা কল্পনাপ্রসূত নয়। অবশ্য প্রশ্নগুলো ঘটনার স্থান, নাম উল্লেখ করে বর্গীয় পরিভাষায় এবং প্রকৃত ব্যক্তিগত নামের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষায় (যেমন, 'যায়েদ' ও 'আমর'-উসমানী ফতওয়ার ক্ষেত্রে) অথবা সাধারণভাবে 'পুরুষ' বা 'মহিলা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে তৈরি করা হতো। প্রশ্ন তৈরীর ক্ষেত্রে এরূপ মানদণ্ডের মাধ্যমে মুফতীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতো এবং এর ফলে একটি সমস্যার পূর্বাপর পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় আনা সম্ভব হতো এবং আইনের দৃষ্টিতে অনুমিত কোন ঘটনার মূল্যায়নও করা যেতো।

কোন বিষয়বস্তু মুফতীগণ যেভাবে অনুধাবন করতেন প্রশ্নের জবাব তার আলোকেই প্রদান করতেন। একজন মুফতীর এরূপ উপলব্ধি আবার নির্ভর করতো তার স্থানীয় প্রথা এবং কথ্য ভাষা অনুধাবনের ক্ষমতার উপর। অধিকাংশ ফতওয়া সংকলন গ্রন্থে সাদামাটাভাবে প্রণীত, দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্টভাবে তৈরী প্রশ্নগুলোকে সম্পাদনা করে পুনঃলিখন বা একইসঙ্গে বাতিল করতে হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মূল গ্রন্থাবলীর তত্ত্ব অনুযায়ী এবং উসমানী সাম্রাজ্যে অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী যখন কোন প্রশ্ন অস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়, তখন মুফতীগণ স্পষ্টতই তাদের জবাবে বিষয়টি এ বলে মুলতবী রাখতে পারতেন যে, প্রশ্নের মধ্যে লভ্য তথ্যের উপর এর জবাব নির্ভর করবে। মুফতীগণ সাধারণত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে শরীয়ার সার্বিক দিক পর্যালোচনা করতেন; এমনকি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত চুক্তি ও শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং সাধারণত আদালত বহির্ভূত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি খতিয়ে দেখতেন। ঐতিহাসিক কিছু ঘটনায় দেখা যায় যে, মুফতীগণ এ সকল আইনগত বিষয়গুলোর বাইরেও মতামত দিতেন। তবে ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের কোন কোন আলেম মনে করতেন যে, কতিপয় ক্ষেত্রে মুফতীগণের প্রশ্নের জবাব দেয়া সমীচীন নয়, যেমন-আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও ধর্মতত্ত্ব। শরীয়ার বাইরের কোন বিষয়ে উসমানী সাম্রাজ্যের মুফতীগণ রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় ফতওয়া জারী করতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুহাম্মাদ রশীদ রিদা তার প্রকাশিত সাময়িকীর (আল-মানার) মাধ্যমে সারা দুনিয়া থেকে প্রাপ্ত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সামনে উদ্ভাসিত আইন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির উপর বহুবিধ প্রশ্নের উপর ফতওয়া দিতেন।

যদিও বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফতওয়ার মধ্যে এক ধরনের অভিন্নতা পরিলক্ষিত হতো, তা সত্ত্বেও স্থানীয় বিধিগত সংস্কৃতি ও প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতার দ্বারাও প্রভাবিত হতো। এভাবে বিভিন্ন এলাকার ফতওয়ার মধ্যে ভাষা, ঐতিহ্যগত প্রথা ও বাক্যালংকারিত্বে পার্থক্য দেখা যেতো। তাত্ত্বিক মূল গ্রন্থগুলোতে ফতওয়ার প্রারম্ভ, সমাপ্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত

শর্তাবলী ও সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ ফতওয়ার শেষে আরো উল্লেখ করা হতো 'আল্লাহু আলাম' (আল্লাহ অধিক ভালো জানেন) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কথা। মূল গ্রন্থাবলীতে ফতওয়ার মূল ভাষ্যের কাঠামোগত বিন্যাসও বিবেচিত হয়েছে। এতে ফতওয়ার কাগজে শূন্য স্থান রেখে দেয়া বা এক প্রস্থের বেশী কাগজ ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে, যাতে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। প্রশ্ন থাকে প্রশ্নকারীর বা একজন সচিবের হাতে; কিন্তু ফতওয়াটি সাধারণত মুফতীর নিজস্ব কর্তৃত্বের লিপিতে লিখিত হয়। মূল ফতওয়া হস্তান্তর করার আগে একজন মুফতী নীতিগতভাবে তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শুনানীতে উপস্থিত আলেমগণের সাথে পরামর্শ করে নিতেন।

যদি প্রশ্নকারী ফতওয়া হাতে পাওয়ার পর তা সঠিকভাবে বুঝতে না পারতো তাহলে তিনি মুফতী বা ব্যক্তিবিশেষের সাথে একান্তে সাক্ষাত করে সাহায্য চাইতে পারতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ফতওয়ার বিকল্প বা ব্যঞ্জনা সম্পর্কে পরবর্তী প্রশ্নের উদ্ভব হতো। কোন বেসরকারী মুফতীর মতামত যদি কেউ গ্রহণযোগ্য মনে না করতেন, তিনি অপর মতামতের জন্য পৃথক কোন মুফতীর সাথে পরামর্শ করতে পারতেন।

মুফতীগণ অনেক ক্ষেত্রে বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের লেবাননের সরকারী মুফতীর মত কেউ কেউ বস্তুত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। গত শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত গ্রান্ড মুফতীগণ সরকারীভাবে ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। উসমানী সাম্রাজ্যের 'শায়খুল-ইসলাম'-এর মত ফতওয়া প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ছিলেন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে মুফতীদের আরেক ধরনের প্রভাব ছিল যাকে সুনাম-সুখ্যাতি ও আইন শাস্ত্রের উপর অগাধ জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করা হতো। তারা লেখা, নির্দেশনা, ফতওয়া প্রদান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কর ও রাজস্ব নিয়ন্ত্রণেও নেতৃত্ব দিতেন। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী উভয়ের কাছেই রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ফতওয়ার লড়াই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

বেসরকারী পর্যায়ে ফতওয়া প্রদানের তত্ত্বে বলা হয় যে, ফতওয়া হওয়া উচিৎ বিনা মূল্যে, উপহার হিসেবে এবং ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত। সরকারী মুফতীগণ অবশ্য বেতন পেতেন বা প্রশ্নকারীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফী পেতেন এবং এভাবে অনেকে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, যেখানে আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ফতওয়া গ্রহণ করা জরুরী মনে করা হতো, সেখানে মুফতীর জারীকৃত মতামত সরকারী আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারতো। অপরদিকে মুফতীর কাছে

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ফতওয়া চাইতে গেলে তা ব্যয়ের হিসেবে অপেক্ষাকৃত সস্তা, কম বিরোধপূর্ণ ও অধিকতর মোক্ষম বিকল্প ব্যবস্থা।

ফতওয়ার সামগ্রিক তাৎপর্যকে দু'ভাগে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, প্রধান আইনবেত্তাদের প্রদত্ত ফতওয়া হচ্ছে মতাদর্শগত প্রশ্ন, সামাজিক বিষয় ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক, আইনগত ও ধর্মীয় মতামত। এরূপ ক্ষেত্রে মুফতীগণ মুসলমানদের জীবনের নানা পরিবর্তন ও ব্যাপক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা সম্পর্কে শরীয়ার আলোকে ব্যাখ্যাদানের জন্য তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কাজে লাগান। তাদের প্রদত্ত এরূপ ব্যাখ্যাদানের প্রভাব অবশ্য সংশ্লিষ্ট সমাজে শরীয়া সার্বিকভাবে কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে তার উপর নির্ভরশীল। সরকারী ও বেসরকারী মুফতী এবং বিভিন্ন মাযহাবী প্রতিষ্ঠান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ সকল স্তরের সাধারণ মানুষের জন্য ফতওয়া জারী করে শরীয়ার আলোকে মুসলমানদের জীবন পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন।

ফত্ওয়ার সমকালীন প্রয়োগ

'মুফতী'র আনুষ্ঠানিক সরকারী অফিস প্রতিষ্ঠা লাভের বহু পূর্বেই 'ফত্ওয়া' একটি অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ লাভ করে। 'ইফতা' (ফতওয়া জারীর কার্যক্রম) সংক্রান্ত প্রাথমিক তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে ফত্ওয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক সুপ্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে উপলব্ধি করা গেছে। 'ফত্ওয়া' বিষয়টি সাধারণত আইন শাস্ত্রের নীতিমালার (উসূল আল-ফিক্হ) 'ইজতিহাদ' অংশে আলোচিত হয়েছে। 'ইজতিহাদ' হচ্ছে আইন কার্যকর করার বিষয়ে মতামত প্রদানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস। অপরদিকে ফত্ওয়া হচ্ছে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে একজন মুজতাহিদের সামাজিক ভূমিকা, যা একজন বিচারকের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থেকে আলাদা। ফতওয়া হচ্ছে একজন ফত্ওয়া প্রার্থীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক নয় এমন আইনগত মতামত। এভাবে একজন মুফতী সহজাতভাবেই নিরপেক্ষ হতে পারেন না। কারণ তিনি কোন বিরোধ প্রসংগে এক পক্ষের উত্থাপিত প্রশ্নেরই শুধু জবাব দিয়ে থাকেন। এরূপ পক্ষপাতিত্বের প্রেক্ষিতে বিষয়টির বাস্তবতা মেনে নিয়ে বলা যায় যে, মুফতীর মতামত বাধ্যতামূলক নয়; পক্ষান্তরে বিচারকের রায় বাধ্যতামূলক—এ দু'য়ের মাঝখানে 'উসূল' কার্যকর হয়। অধিকন্তু একজন বিচারকের কাজ হচ্ছে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ফতওয়া প্রয়োগযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। এরূপ পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে ধারণাগতভাবে এটা দাঁড়ায় যে, ফতওয়া হচ্ছে একজন মুজতাহিদ কর্তৃক আইনের তাত্ত্বিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিচারক কর্তৃক আইন প্রয়োগের মধ্যবর্তী একটা অবস্থানে প্রদত্ত মতামত। এভাবে একজন মুফতী আইনের মতবাদ বিকাশে যেমন ভূমিকা রাখেন, তেমনি এর বাস্তব প্রয়োগের

ক্ষেত্রেও।

একাদশ শতাব্দীর পূর্বে একজন মুফতী বলতে তাকেই বুঝানো হতো যিনি সাধারণভাবে ফত্ওয়া প্রদান করেন। তখন কারো মুফতী হওয়ার এই শর্ত ছিল যে, তার ইলম ও আলেমগণ কর্তৃক তার স্বীকৃতি। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন মুফতীর অফিস ছিল বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত 'ইফতা' প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত। একাদশ শতকে খোরাসানে একটি শহরের শায়খুল ইসলাম স্থানীয় উলামার প্রধান ছিলেন এবং তিনি প্রধান মুফতী হিসেবে কাজ করতেন। মামলূক শাসনামলে প্রাদেশিক রাজধানীর আপীল আদালতগুলোতে প্রতি মাযহাবের জন্য একজন করে মুফতী নিয়োগ করা হতো। উসমানী শাসকগণ প্রতি শহরের জন্য একজন করে মুফতী নিয়োগ করতেন। মুফতীদের সার্বিক কাজ সমন্বিত করে প্রশাসনিক পদ্ধতি গড়ে তোলা হয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যের অংশ হিসেবে 'ইফতা' প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করে। সুলতান মুরাদ দ্বিতীয় (১৪২১-১৪৪৪, ১৪৪৬-১৪৫১) 'শায়খুল ইসলাম' নামক সম্মানজনক পদটি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রের প্রধান সরকারী মুফতী পদে রূপান্তরিত করেন। সুলায়মান কানূনী তার শাসনামলে (১৫২০-১৫৬৬) মুফতীর পদটি খণ্ডকালীন থেকে পূর্ণকালীন আনুষ্ঠানিক পদে উন্নীত করেন। সুলায়মান ইস্তাম্বুলের মুফতীকে শায়খুল ইসলাম পদে নিযুক্তি দেন এবং তাকে সমগ্র সাম্রাজ্যের ধর্ম বিষয়ক প্রধানের মর্যাদা দেন। উসমানী শাসকগণ ফতওয়াকে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি দেন যা আগে ছিলো না। শায়খুল ইসলামকে একমাত্র সুলতানই নিয়োগ প্রদান বা বরখাস্ত করতে পারতেন।

বিনিময়ে সুলতানের ক্ষমতায় আসীন হওয়া বা ক্ষমতাচ্যুত হওয়া শায়খুল ইসলামের প্রদত্ত ফত্ওয়া দ্বারা স্বীকৃত হতো। অবশ্য শায়খুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করতে হতো এবং তার রায় কার্যকর করতে বিচারকের (কাজী) প্রয়োজন হতো।

উসমানী শাসনাধীনে শায়খুল ইসলামের প্রকৃত ক্ষমতার ব্যাপারে যে অস্পষ্টতা ছিল তার প্রেক্ষিতে ঐ পদটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এক তত্ত্ব অনুযায়ী মুফতীর পদটিকে কনস্টান্টিনোপলের গীর্জার প্রধান বিশপের পদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এ তত্ত্বে উসমানী শাসনব্যবস্থার পূর্ববর্তী সময়ে সাধারণভাবে মুফতী পদটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে শায়খুল ইসলামের পদবীটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচিত হয়নি। এক্ষেত্রে অধিকতর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে মুফতীর পদটি কী ক্ষমতাসীন সরকারের কর্তৃপক্ষকে আইনগত বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, নাকি এরূপ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে করা হয়েছিল। এরূপ একটা সম্ভাবনার কথা বলা যায় যে, ঐ পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামী বৈধতা দান করা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক

ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রধান সূত্র হিসেবে ইসলামের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। অবশ্য উসমানী শাসকগণ তাদের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার একটা নিরাপদ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন অর্থাৎ ঐ পদটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর মধ্যে আত্মীকরণ করা হয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ শায়খুল ইসলামের পদটি তাত্ত্বিকভাবে সুলতানের সমপর্যায়ের গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে সুলতানের অধীনস্থ পর্যায়ে পদাবনত করা হয়।

উসমানী সাম্রাজ্যের বাইরে শায়খুল ইসলাম পদের সমপর্যায়ের পদটি বিভিন্ন নামে বিদ্যমান ছিল। মোঘল ভারতে ধর্মীয় বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান ছিলেন 'সদর-আসসুদুর,' অপরদিকে সূফীদের বিষয়ে দেখাশোনা করতেন শায়খুল ইসলাম। সাফাবী শাসনামলে ইরানে শায়খুল ইসলাম গ্রান্ড মুফতী বা ধর্মীয় বিষয়ের প্রধান কোনটিই ছিলেন না। এ সকল কার্যাবলী 'সদর'-এর জন্য সংরক্ষিত ছিল; যিনি রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিয়া মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব পালন করতেন। 'সদর' নিয়োগ ছাড়াও রাষ্ট্র কর্তৃক রাজধানী ও অন্যান্য প্রাদেশিক শহর-নগরে 'শায়খুল ইসলাম' নিয়োগ করা হতো। এ সকল শায়খুল ইসলাম তাদের স্ব স্ব এলাকায় ধর্মীয় বিষয়ের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন এবং তারা সাধারণভাবে 'সদর'-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। তারা স্থানীয় বিচারকদের (কাযী) কর্মকাণ্ডও তত্ত্বাবধান করতেন। সাফাবী শাসনামলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গায়েবী ইমামের অনুসারী হিসেবে শাসকদের তুলে ধরতো (এভাবে এদেরকে 'আল্লাহ্‌র ছায়া' বলা হতো)। পরবর্তী কালে তাদের এরূপ দাবি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং গায়েবী ইমামের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি মুজতাহিদদের হাতে পুনঃসমর্পণ করা হয়। এসব ব্যক্তিবর্গ ছিলেন স্বাধীন আলেম যাদের কোন পদ বা দপ্তর ছিলো না। তারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হতেন না বা তাঁরা বেতনও গ্রহণ করতেন না। অষ্টাদশ শতকে শিয়া মতবাদের দু'টি ধারা-উসূলী ও আখবারীদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক দেখা দিলে উসূলীদের পক্ষে তার ফয়সালা হয়। উসূলীদের মতানুযায়ী মুসলমানদেরকে একজন জীবিত 'মুজতাহিদ'-কে (মারজা আত-তাকলীদ) বেছে নিতে হবে এবং তাকে অনুসরণ করতে হবে। কাজার শাসনামলে মুজতাহিদগণ ইমামের সামষ্টিক নেতৃত্বের দাবি সুস্পষ্টভাবে উত্থাপন করেন। একজন 'মুজতাহিদ' বা একজন 'মারজা' তার জ্ঞান ও পরহেজগারিতা দ্বারা একজন সাধারণ মুসলমানের নিকট আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারেন। এভাবে একজন সুন্নী মুফতী ও একজন শিয়া মারজা আইনের ব্যাখ্যা প্রদানে ভূমিকা নিতে পারেন। অবশ্য তাদের এ দু'টি পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য রয়েছে। শিয়া মুজতাহিদের মত একজন সুন্নী মুফতীর ফত্‌ওয়া বাধ্যতামূলক নয়। অধিকন্তু দেখা যায় যে, উসমানী শাসনামলে সময়ের ব্যবধানে মুফতী পদটি ক্রমান্বয়ে সাফল্যের সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে

যায়। পক্ষান্তরে শিয়া মুজতাহিদগণ ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের আদর্শগত ও বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ থেকে অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকেন।

ইসলামী বিশ্বে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণভাবে এবং মুফতীর পদটি বিশেষভাবে ক্রমান্বয়ে সরকারী কাঠামোভুক্ত হয়ে পড়ার ফলে উলামা শ্রেণী বৃহত্তর সামাজিক মর্যাদা, উচ্চতর আয় ও বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা পেতে শুরু করেন। অবশ্য সরকারী মুফতীগণ ফতওয়া জারীর ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে পারতেন না এবং বেসরকারী মুফতীগণকেও 'ইফতা' কার্যক্রমে জড়িত থাকার জন্য সরকারী অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হতো না। আধা-সরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত 'ইফতা'-র স্বীকৃতি প্রতিফলিত হতো সরকারী মুফতী নিয়োগের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, উসমানী সাম্রাজ্যে একজন মুফতী নিযুক্ত হতেন আজীবনের জন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ সময়ের জন্য। পক্ষান্তরে বিচারকগণ নিযুক্ত হতেন এক বছর মেয়াদের জন্য। যেমন একজন বিচারক হয়তো ইস্তাম্বুলের হানাফী মাযহারের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন, কিন্তু প্রায়শই মুফতী হিসেবে হয়তো তার শহরের অ-হানাফী কোন গণ্যমান্য আলেম ব্যক্তি নিযুক্ত হতেন। এ সকল স্থানীয় মুফতীগণ তাদের নিজ শহরের সার্বিক অবস্থা ও রীতি-প্রথা সম্পর্কে অধিক বেশী জানতেন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই তাদের নির্বাচন করতেন এবং ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় সরকার তা অনুমোদন করতেন।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার প্রেক্ষিতে 'ফত্ওয়া' প্রতিষ্ঠানটি সামাজিকভাবে স্পষ্টতই বহুমুখী গুরুত্বের অধিকারী হয়ে উঠে। একটি আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আনুষ্ঠানিক 'ফত্ওয়া'কে আদালতের আইনগত প্রক্রিয়ার একটি কার্যকর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা প্রতিষ্ঠিত আইনগত মতবাদের সম্প্রসারণ, সংশোধন বা উন্নয়নের জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়াস বলে গণ্য হতে পারে। বিকল্পভাবে বলা যায়, একজন আলেম ব্যক্তি তার নিজের উদ্যোগে একটি দলীল ঘোষণা বা শিক্ষা হিসেবে একটি ফত্ওয়া জারী করতে পারেন। উল্লেখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে একজন মুফতী, আলেম, শিক্ষক বা ধর্মপ্রচারক ছোট বা বড় ধরনের ফত্ওয়া জারী করতে পারেন। ছোটখাট কোন ফত্ওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলোঃ আইনের বাস্তব প্রয়োগ, জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যা অথবা আইনগত পরিভাষা বোধগম্য নয় এমন লোকজনের কাছে ব্যাখ্যা তুলে ধরা, যথোপযুক্ত সামাজিক আচার-আচরণের বিষয়ে নির্দেশনা বা আইনগত ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন অথবা আদালতে পুনরায় না গিয়ে কিভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় তার পরামর্শ। সামাজিক বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক সংস্থা এবং অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক হিসেবে ফত্ওয়া সামাজিক স্থিতিশীলতায় অবদান রেখেছে।

পক্ষান্তরে বড় ধরনের ফত্ওয়াগুলো হচ্ছে জনজীবন সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালার উপর প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি যা কখনো কখনো আইনের সংকলনে পরিণত হতো। উদাহরণস্বরূপ, উসমানী শাসনব্যবস্থায় যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা ও সংস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা শায়খুল ইসলামের 'ফত্ওয়া' দ্বারা অনুমোদিত হতে হতো। ফত্ওয়া কেবল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শরীয়া-বহির্ভূত আইনকে (যেমন উসমানী কর ও ফৌজদারী আইন) বৈধ প্রমাণ করার জন্যই নয়; সুলতানের নিজ ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা বা প্রত্যাখ্যানও ফতওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, সুলতান মুরাদ পঞ্চমকে উন্মাদ হওয়ার কারণে ফত্ওয়ার ভিত্তিতে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। ফত্ওয়া দ্বারা নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যব্যবস্থাকেও বৈধতা দেয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ, উসমানী শাসনব্যবস্থায় ফত্ওয়া দ্বারা ১৭২৭ সালে ধর্মবিষয়ক নয়, এমন বই-পুস্তক মুদ্রণের অনুমতি দেয়া হয়; ১৮৪৫ সালে প্রতিশেধক টীকাদানকে বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং বেশ কিছু ফত্ওয়া দ্বারা নিম্ন হারের মুনাফা, ধারে বিক্রি, নগদ অর্থ ওয়াকফ করার অনুমতি দেয়া হয়। মুফতীগণ বিচারক ও অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা হ্রাসকরণে ভূমিকা নিতেন। জনগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগে সাড়া দিয়ে এবং তাদের আইনগত অধিকারের প্রতি জোরালো ও সুস্পষ্ট সমর্থন দিয়ে ফত্ওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনার জন্য অনুমতি দেয়া হতো।

সামাজিক ও ধর্মীয় বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় স্ব স্ব বক্তব্যের সমর্থনে ফত্ওয়া চাইতো। উদাহরণস্বরূপ, নীতিবাদী গোষ্ঠীর নেতা ও সদস্যরা সূফীবাদী কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে ফত্ওয়া প্রার্থনা করেছিল। এরূপ অধিকাংশ ফত্ওয়া আবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হতো। একটি বিখ্যাত ফত্ওয়ায় উসমানী শাসনকালে শায়খুল ইসলাম ইবুস সুঊদ মেমার আফেন্দী (আবুস সুউদ আফান্দী, ১৫৪৫-১৫৭৪) সূফীদের বাড়াবাড়ি ও তাদের সমালোচকদের প্রতি তাদের প্রতিহিংসাকে দূষণীয় বলে মত দেন।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। উসমানী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কাঠামোতে পতনের সূচনা এবং তার বিপরীতে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ফত্ওয়া প্রতিষ্ঠানের সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, ইউরোপের উপনিবেশিক প্রশাসন এবং পরবর্তীতে তাদেরই পরিত্যক্ত উপনিবেশিক ধ্যানধারণায় গঠিত জাতি-রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দখল করার ফলস্বরূপ আনুষ্ঠানিক ফত্ওয়ার বাস্তব গুরুত্ব হ্রাস পায়। অবশ্য এ সময় উপনিবেশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন ও জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জণগনকে সক্রীয় নীরব সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'ফত্ওয়া' একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপনিবেশ

বিরোধী ফত্ওয়ায় ইসলামী ভূখণ্ড (দারুল ইসলাম) এবং যুদ্ধমান অবিশ্বাসীদের (কাফের) ভূখণ্ডকে (দারুল হারব, দারুল কুফর) চিহ্নিত করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে, যেমন মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক কিনা বা দারুল হরব থেকে হিজরত করা সমীচীন কিনা, সে সম্পর্কেও ফত্ওয়া দেয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বহু ফতোয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ১৮০৪ সালে উসমান ইবনে ফুজি পশ্চিম আফ্রিকায় (বর্তমানে উত্তর নাইজেরিয়া) জেহাদ ঘোষণা করেন। ইবনে ফুজি তার যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, তাদের ভূখণ্ড অবিশ্বাসীদের দখলে থেকে দারুল হারব (শত্রুরাষ্ট্র) হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন যে, অবিশ্বাসীদের শাসিত এলাকা থেকে হিজরত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। এর এক বছর আগে ভারতের বিখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র বিশিষ্ট আলেম শাহ আবদুল আযীয (১৮২৪ খৃ.) ঘোষণা করেন যে, ভারত বৃটিশ শাসনাধীনে 'দারুল হারব'-এ পরিণত হয়েছে। তিনি তার যুক্তির সপক্ষে আরো বলেন যে, ভারত অমুসলিমদের আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছে। তার পরপরই সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদ আন্দোলন ঘোষণা করে যে, ভারতের অধিকাংশ জায়গাই দারুল হারবে পরিণত হয়েছে এবং এজন্য মুসলমানদের উচিত উত্তর ভারতে হিজরত করা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময়ও একই রকম যৌক্তিকতা পেশ করা হয়। এ সময় দিল্লীর আলেমগণ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ফত্ওয়া প্রদান করেন। তথাপি একথা ঠিক যে, কোন ভূখণ্ডকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করার পর 'হিজরত' বা 'জিহাদের' মত ব্যাপক পরিবর্তনশীল ঘটনা সর্বদা ঘটতো না। উদাহরণস্বরূপ, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলন ভারতকে 'দারুল কুফর' (কাফেরদের রাষ্ট্র) হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু তারা 'জিহাদ' ঘোষণা করেননি। অবশ্য প্রতিকার হিসেবে তারা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গ জুমুআর নামায আদায় থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

হিজরত ও জিহাদের মত বিপ্লবী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি শীঘ্রই ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৭০ সালে উত্তর ভারতের আলেমগণ ফত্ওয়া জারী করেন যে, ভারতের মুসলমানদের জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা তাদের জন্মভূমি থেকে হিজরত করা বাধ্যতামূলক নয়। আবদুল কাদির আল-জাযাইরীর নেতৃত্বে (মৃ. ১৮৮৩ খৃ.) আলজেরিয়ায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহ থেকেও বিষয়টি একইভাবে উপলব্ধি করা যায়। তার নেতৃত্বে (১৮৩২-১৮৪৭ খৃ.) বিদ্রোহ চলাকালে আবদুল কাদির তৎকালে আলজেরিয়ায় বসবাসকারী মালিকী ও হানাফী আলেম এবং অন্যান্য স্থানের আলেমদের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্নে

ফত্ওয়া কামনা করেনঃ "ফরাসী নিয়ন্ত্রিত আলজেরিয়া এলাকা থেকে হিজরত করা ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক কি না, যেসব মুসলিম ফরাসী শাসনাধীনে অবস্থান করবে এবং যারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতে অস্বীকার করবে তাদের উপর শাস্তি/জরিমানা আরোপ করা যাবে কি না এবং যেসব লোক ফরসীদের দালাল হিসেবে কাজ করছে তারা এবং মরক্কোর সুলতান যিনি ফরাসীদের চাপে আবদুল কাদিরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বৈধভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না"। যদিও সকল ফত্ওয়ার জবাবেই আলজেরিয়ার সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু তারা কোন ভূখণ্ডকে শত্রুর ভূখণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। এক্ষেত্রে মাযহাবগত পার্থক্য রয়েছে। মালিকী মাযহাবে কোন ভূখণ্ডের মর্যাদা নির্ধারণ করা হয় শাসকের পরিচয়ের ভিত্তিতে; কিন্তু শাফিঈ ও হানাফী মাযহাবে ভূখণ্ডের মর্যাদা নির্দ্ধারণ করা হয় ব্যক্তিবিশেষ ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার সামর্থ্য রাখে কি না তার ভিত্তিতে। আবদুল কাদির গ্রেপ্তার হওয়ার পর ফরাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিরোধ সংগ্রাম ঝিমিয়ে পড়ে, তবে অনেক আলজেরীয় অন্যান্য মুসলিম দেশে হিজরত করেন। আলজেরিয়ার মুসলমানদের শান্ত করা এবং তাদের দেশত্যাগ বন্ধ করার লক্ষ্যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ মক্কার শাফিঈ ও হানাফী মুফতীদের নিকট থেকে ফত্ওয়া সংগ্রহ করে। তারা ফত্ওয়ায় উল্লেখ করেন যে, অবিশ্বাসীদের শাসনাধীনে মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি যদি বিপদের সম্মুখীন না হয় এবং তারা যদি ইসলামী বিধিবিধান বিনা বাধায় পালন করতে পারে তাহলে তাদের দেশত্যাগ বা যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়।

সংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় রাজনীতিতে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করার পদ্ধতি শুরু হওয়ার পর ফত্ওয়ার স্থলে স্থান পেয়েছে প্রচারপত্র ও ঘোষণাপত্র। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৭ সালে মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমুন দল এক প্রচারপত্রে ঘোষণা করে যে, ফিলিস্তীনের জন্য জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ১৯৩৮ সালে সিরীয়া ও ইরাকেও একই ধরনের ঘোষণা দেয়া হয়। ফত্ওয়ার রাজনৈতিক ফায়দা অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণাকে বাতিল করে দেয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ফত্ওয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৪ সালে ফেজ-এর আলেমগণ এক ফত্ওয়া জারী করে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত ইউরোপীয় (বিশেষত ফরাসী) বিশেষজ্ঞদের বহিষ্কার করার দাবি জানান। ১৯০৭ সালে মারাকেশের আলেমগণ ফরাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় মরক্কোর সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ফত্ওয়া জারী করেন। উভয় ক্ষেত্রেই দাবি উত্থিত হয়েছিল। ১৮৯১ সালে ইরানী মুজতাহিদ মির্জা হাসান সিরাজী কর্তৃক প্রদত্ত ফত্ওয়াও যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিল। তিনি বৃটিশদের একচেটিয়া তামাক ব্যবসা বহাল থাকা অবস্থায় ধুমপান নিষিদ্ধ করে

ফত্ওয়া দেন। বিংশ শতকে প্রদত্ত আরো বেশ কিছু ফত্ওয়ায় মুসলমানদেরকে অনৈসলামিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৩ সালে ইরাকের আলেমগণ ইহুদীদের উৎপাদিত পণ্য বয়কটের আহবান জানান। আরেকটি বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে, ১৯৭১ সালে ইরানের সম্রাট কর্তৃক আড়াই সহস্রাব্দ পালনের ব্যাপার আয়াতুল্লাহ খোমেনী প্রদত্ত ফত্ওয়া। ইমাম খোমেনী তার ঘোষণায় বলেন যে, যে বা যারা এ অনুষ্ঠান আয়োজন করবে বা তাতে অংশগ্রহণ করবে তারা ইসলাম ও ইরানী জাতির শত্রু। প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বিদ্রোহে অংশগ্রহণের আবেদন ছাড়াও খোমেনী ইসলামী বিপ্লব পরিষদ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পার্লামেন্ট গঠনের জন্য ঘোষণা ও ফত্ওয়া জারী করেন। তার সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফত্ওয়া জারী করা হয় ১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী 'স্যাটানিক ভার্সেস' গ্রন্থের ব্যাপার। এ ফত্ওয়ায় ইমাম খোমেনী ঐ গ্রন্থের লেখক সালমান রুশদীকে ধর্মবিদ্বেষ, স্বধর্মত্যাগ ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষায় ইসলামের প্রতি আক্রমণের কারণে হত্যা করার আহবান জানান। ঐ গ্রন্থটি অধিকাংশ মুসলিম দেশেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বইটির নিন্দা করে। এর মধ্যে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। তবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ কথা বলে যে, রুশদীকে দুঃখ প্রকাশ করার সুযোগ দান এবং বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে হত্যা করা ঠিক হবে না।

সমাজের লোকজন ফত্ওয়া প্রদত্ত সুপারিশ স্বউদ্যোগে কতটা পালন করবে তার উপর নির্ভর করবে সমাজে ফত্ওয়ার প্রভাব কতটা পড়বে। অবশ্য মুফতীর ভূমিকা ও তার সুনাম, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ও সরকারের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির উপরও ফত্ওয়ার সামাজিক প্রভাব নির্ভর করে। ঐতিহাসিকভাবে ফত্ওয়া সমাজ নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্গঠনের কারিগর হিসেবে কাজ করেছে। আজকের যুগে 'ফত্ওয়া' নামক প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর একটি ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে যার মাধ্যমে একটি সমাজ তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে পারে।

(মূল প্রবন্ধটি অক্সফোর্ড এনসাইক্লোপেডিয়া অব দি মডার্ন ইসলামিক ওয়ার্ল্ড থেকে সংগ্রহীত। এটি পরবর্তী ইংরাজী নিবন্ধটির বাংলা রূপ। ভাষান্তর করেছেন ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব)।

(Be circulated)

From the

Oxford Encyclopedia of the

MODERN ISLAMIC WORLD

FATWĀ. [*To describe the role of* fatwā *as an instrument of religious law, this entry comprises three articles:*

Concepts of Fatwā
Process and Function
Modern Usage

The first article provides a general overview, with attention to variations in meaning of the term: the second describes how fatwās *are generated and produced; and the third considers the history of use and the political utility of* fatwās *in the nineteenth and twentieth centuries. For related discussions, see* Ijtihād; Law; Mufti; 'Ulamā'.]

Concepts of Fatwā

An overview of the history of *fatwā* suggests three different concepts associated with the term: management of information about the religion of Islam in general, providing consultation to courts of law, and interpretation of Islamic law. The first concept, which has been central through history, has reappeared more prominently in modern times, as is evident from the contents as well as from the definitions given in modern collections of *fatwās*. For instance, *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband* (Deoband, 1962) defines *fatwā* as "an issue arising about law and religion, explained in answer to questions received about it" by the *muftīs* of Deoband, a reformist school of religious learning established in 1867. The continuity of tradition in these modern developments cannot properly be appreciated without a look at the semantic growth of the concept in early Islam.

Literally, *fatwā* is derived from the root *fata*, which includes in its semantic field the meanings "youth, newness, clarification, explanation." These connotations have survived in its various definitions. Its development as a technical term originated from the Qur'ān, where the word is used in two verbal forms meaning "asking for a definitive answer" and "giving a definitive answer" (4.127, 176).

The concept of *fatwā* in early Islam developed in the framework of a question-and-answer process of communicating information about Islam. Its subject was *'ilm* (knowledge) without further specification. Later, when *'ilm* was identified with *ḥadīth*, *fatwā* came to be associated with *ra'y* (opinion) and *fiqh* (jurisprudence or law). The technical usage of the term was further refined when, after the compilation of legal literature by the different schools, the term *fatwā* was used for cases not covered in the *fiqh* (law) books.

The contrastive method of defining *fatwā*, as employed in the Islamic literature, in fact reflects the varying emphases in the concepts of *fatwā*. From the perspective of the scope of subjects covered, *fatwā* is contrasted with *mutūn* (textbooks of Islamic law); *fatwā* covers a wider scope, including matters of legal theory, theology, philosophy, and creeds, which are not included in *fiqh* books. Thus the concept of *fatwā* retains a broader concern about religion and society than is reflected in the formal Islamic law defined by the schools. From the perspective of judicial authority, jurisdiction,

and enforceability, *fatwā* is contrasted with *qaḍā* or court judgment. The jurisdiction of *fatwā* is wider than *qaḍā;* matters such as *ʿibādāt* (religious duties or obligations) are excluded from the jurisdiction of the courts, even though they are essential parts of Islamic law and appear very prominently in *fiqh* books and *fatwās*. Note, however, that *qaḍā* is binding and enforceable, but *fatwā* is not. The concept of *fatwā* can therefore be seen as an indirect instrument for defining the formal concept of law as applied in courts. From the perspective of moral and religious obligation, *fatwā* is contrasted with *taqwā* or piety. For instance, a *fatwā* may allow choice between a lenient *(rukhṣah)* and a severe *(ʿazīmah)* view about the permissibility of a certain matter, or it may resort to legal devices *(ḥīlah)* to circumvent the strict implications of a law, but *taqwā* may not approve of such strategies. This last contrast is often referred to in literary and Ṣūfī writings.

Fatwā functioned independent of the judicial system, although in some systems *muftīs* were attached officially to the courts. Thus in Andalusian courts *muftīs* sat as *mushāwar* (jurisconsults), and in early British Indian courts they sat as *mawlawīs* (men of learning). The jurists compiled volumes of *fatwās* stating, for the benefit of the judges, the consensual and authoritative views and doctrines of a particulate school.

The position of *muftīs* in a Muslim political system was defined depending on the role and place of *fiqh* in the society. In Andalusia the jurists were indeed powerful; they were part of the Shūrā (council) of the amirs and caliphs. In the Ottoman and Mughal political systems the chief *muftī* was designated as *shaykh al-Islām*. *Muftīs* were also appointed to various other positions including market inspectors, guardians of public morals, and advisors to governments on religious affairs.

Under colonial rule the *madrasahs* took over the role of *muftīs* as religious guides. The *madrasahs* established the institution of *dār al-iftā*, a place to issue *fatwās*. The print and electronic media in the nineteenth and twentieth centuries reinforced the role and impact of *fatwās*. *Muftīs* were faced with day-to-day changes in society in the fields of economics, politics, science, and technology. Not only did the scope of *fatwā* widen, but because of its instant availability to a wider public, its language, presentation, and style also changed.

The ideological authority of the *fatwā* is invariably explained by saying that a *muftī* is the deputy and successor to the Prophet, the lawgiver. Legally, the authority of the mufti is derived from the doctrine of *taqlīd* (adherence to tradition), which demands consulting the learned, often those of a particular school of law, and following their opinions. Since a *muftī* has to cite authorities for his opinion, his authority is moral and institutional, not personal. For this reason the qualifications of a *muftī* and the rules for issuing a *fatwā* have been developed in considerable detail. A *mustaftī* (inquirer) should accept and obey the opinion of the *muftī* when he is satisfied that he is competent and that his opinion is based on earlier authorities. Theoretically, a *muftī* must be a *mujtahid* (an interpreter of law qualified to exercise legal reasoning independently of schools of law) yet a *muqallid* (an adherent to a school) is also allowed to issue a *fatwā*, as long as he mentions the source of his citation.

Modern scholars usually define *fatwā* as a formal legal opinion given by an expert on Islamic law. Émile Tyan (1960, p. 219) argues that this institutional came into being because no legislative power existed in Islam. He sees the role of the *muftī* in the Muslim political system in the perspective of *shūrā* (consultation) and legislation.

Muslim states, especially in the modern period, have tried to control *fatwā* by instituting organizations that provide consultation to the state and issue *fatwās*, such as the Council of Islamic Ideology in Pakistan or the Hay'ah Kibār al-ʿUlamā' in Saudi Arabia. Their role is advisory, and they are part of the religious, not justice, ministries. In order to appreciate current trends and developments, *fatwā* today should be seen as a function of management and the communication of information.

[*See also* Law, *article on* Legal Thought and Jurisprudence; *and* Muftī.]

BIBLIOGRAPHY

Hunter, W. W. *The Indian Musalmans*. London, 1871. Provides excellent insight into the colonial perception of the role of *fatwā* in a Muslim society in the early nineteenth century, especially its use by the British and Muslims during the 1857 uprising in India against the British.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Al-fatwā bayna al-inḍibāṭ wa-al-tasayyub*. Cairo, 1988. Modern restatement of traditional discussions about the rules and etiquette of writing a *fatwā*. The author provides a comprehensive summary of the legal theory of *fatwā* and a good introduction to some problems in its modern practice.

Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn al-. *Al-fatwā fī al-Islām*. Beirut, 1986. Excellent summary of the *adab al-muftī* literature dealing with the rules and regulations of writing a *fatwā* and qualifications of a *muftī*.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford, 1964. Con-

cise introduction to the nature of the institution of *fatwā* (see pp. 73–75).

Tyan, Émile. "Fatwā." In *Encyclopaedia of Islam*, new ed., vol. 2, p. 866. Leiden, 1960–. Short discussion of the concept and history of the subject, particularly with reference to modern developments.

Tyan, Émile. *Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam*. 2d ed. Leiden, 1960. Excellent review of the history of the institution, and of the discussion of the qualifications, method, and technique of *fatwā* in the Islamic literature (see pp. 219–230).

MUHAMMAD KHALID MASUD

Process and Function

Issued by a *muftī* and taking the form of an answer to a question, a *fatwā* is a considered opinion embodying an interpretation of the *sharī'ah*. A key legal-religious institution, the giving of *fatwās* has flourished across time and place in Muslim societies from early in the Islamic era to the present day, contributing fundamentally to the continuing dynamism of the law and to the regulation of local practices. As a category of legal specialization, however, the issuing of *fatwās* is less familiar than judging. *Fatwās* are similar to the opinions of Roman jurisconsults and to the responsa of Jewish scholars. Compared with the court judgments of their colleagues, the Muslim *qāḍīs*, *fatwās* have a distinct type of authority. In terms of technical status, judgments are "creative" or performative acts while *fatwās* are "informational" or communicative ones; judgments thus are binding and enforceable while *muftīs*' opinions are advisory. But in the absence of a conception of precedent formation in connection with *sharī'ah* court rulings, the authority of judgments tended to remain narrowly specific, pertaining only to particular cases; that of *fatwās*, by contrast, was general, potentially extending to all similar configurations of fact. Judgments were entered into court registers but were not otherwise reported or published, while *fatwās* by noted *muftīs* were apt to be collected, circulated, and cited.

Judges always were public figures, appointed and salaried by the state; *muftīs*, however, were likely to be private scholars, although in a number of historical settings, such as the Ottoman Empire, *muftīs* also served as public officials. In the practical world of *sharī'ah* application, especially before the rise of nation-state legal institutions, the work of *muftīs* complemented that of the court judges, and in many instances there were formal ties between *muftīs* and courts. The two roles were always distinct, however. Where judges heard opposed claims and evidence from pairs of adversaries and then handed down a ruling, the interpretive interchange that resulted in the delivery of a *fatwā* was of a different character. *Muftīs* responded to individual questioners, who typically posed their questions voluntarily. Unlike court judges, who were investigators of evidential fact, *muftīs* took the configurations of fact presented in questions as given. Both judges and *muftīs* are *sharī'ah* interpreters, but their interpretive acts have differing points of departure. While a judge's interpretive work is directed to understanding evidential forms such as testimony, acknowledgment, and oath, that of the *muftī* seeks out indications in the textual sources of the law, including the Qur'ān and the *sunnah*.

Muftīs were identified with specific interpretive communities, such as the various schools (*madhhabs*) of legal thought that subdivide both the Sunnī and Shī'ī traditions, and sometimes also with the programs of particular instructional institutions, such as that at Deoband in India or al-Azhar University in Cairo. Especially in the twentieth century, however, many *muftīs* began to assert their intellectual independence from all such interpretive traditions. Earlier, as is discussed in special treatises concerned with the muftiship (the *adab al-muftī* literature), levels of competence among *muftīs* were specified; the highest was the "absolute" or "independent" interpreter. As a matter of principle, such *muftīs* did not follow the opinions of other jurists or the positions of the schools, but directly interpreted the law through their personal analyses of its basic sources, the Qur'ān and the *sunnah* of the Prophet. Below this highest category were "non-independent" or "affiliated" *muftīs* of several levels, all technically classified as *muqallids*, followers to some degree of established doctrine. *Fatwās* of the highest caliber contain explicit exercises of *ijtihād*, or formal, reasoned interpretation, but even the most unpretentious opinion, which simply states the law in connection with an uncomplicated matter, is an interpretive act.

In theory, *fatwās* could be delivered orally, but aside from the existence of an office established for this specific purpose within the Ottoman *fatwā* administration, it is uncertain how frequently this occurred. Among written *fatwās*, many—perhaps the great majority—were considered routine and as a consequence were dispersed directly to questioners, in some cases without leaving a documentary trace. For the Ottoman Empire and certain of the schools in India, for example, massive collections of such ordinary *fatwās* exist in archives. The early nineteenth-century Yemeni jurist al-Shawkānī distinguished between his unrecorded "shorter" *fatwās*,

which "could never be counted," and his major *fatwās*, which were collected and preserved in book form. At the turn of the twentieth century Muḥammad 'Abduh, the grand *muftī* of Egypt, in addition to his official opinions on matters of state, also issued numerous ordinary *fatwās* to private individuals. The thousands of *fatwās* delivered over several decades by a mid-twentieth-century *muftī* in provincial Yemen, however, were neither collected nor preserved, even as copies, but were written directly on slips of paper containing the original queries, which were returned and carried away by the questioners.

Varying widely in scope, *fatwās* have comprised both the single-word responses ("yes," "no," "permitted," etc.) characteristic of some official Ottoman *muftīs* and also virtual treatises approaching book length. Questioners have ranged up and down the social hierarchies, including both men and women of every status, from the ordinary populace to members of the elite, scholars, court judges, and even heads of state. The *muftīs* themselves have included modest, local-level scholars who occasionally and informally replied to queries arising in their districts and, at the other extreme, the greatest legal minds of an era or powerful state officials at the apex of *fatwā*-issuing bureaucracies. *Fatwās* tend to differ in content according to the level of the *muftī* and the status of the questioner addressed. In general, responses to the untutored are likely to be nontechnical, whereas those issued to scholars typically contain precise citations of sources and indicate the methods of reasoning employed.

The relationship between a *muftī* and an ordinary questioner was predicated on a differentiation of roles. Before the rise of modern school curricula and universal education, *sharī'ah* knowledge was the centerpiece of advanced instruction in societies characterized by patterns of restricted literacy. As a consequence, a limited group of scholarly interpreters controlled an essential body of cultural capital, which included not only the many specific details concerning ritual provisions fundamental for the religious life, but also the precise rules of a wide variety of contracts, transactions, and dispositions that structured legal-economic relations. In such social settings it was considered incumbent on those who had acquired knowledge to communicate it, either through teaching or through acting as a *muftī*. Reciprocally, it was incumbent on the untutored to ask such knowledgeable individuals whenever the need to know *sharī'ah* principle arose. Ideally, *muftīs* were meant to be exemplary moral individuals whose intellectual achievements were matched by appropriate personal decorum. In accord with the social honor vested in them, *muftīs* were approached with respect and deference.

Although the *muftī* of a given locale was typically a well-known figure, some questioners had to make inquiries or travel to find a suitable scholar. Others had to choose among several available *muftīs*. The *adab al-muftī* treatises suggest that a questioner should seek out public information about a *muftī*'s scholarly reputation, but it is acknowledged that such information would be difficult for an uneducated individual to evaluate. The basic recommendation is that the questioner follow the advice of a single just person or trust his or her own sense of the potential *muftī*'s piety. In some settings, questioners dissatisfied with a first *muftī*'s response could seek out a second for another *fatwā*, which they hoped would contain a different view. In other settings, opponents in a dispute approached different *muftīs* to obtain competing *fatwās* to buttress their respective positions.

The interpretive exchange opened with the posing of the question. In their widely varying patterns and concerns, questions provide rich information about the concrete affairs of specific Muslim societies. Questions are of great significance to the interpretive process because they define the terms of the *muftī*'s engagement with the problem under consideration. At the same time, questions frequently were carefully constructed to highlight certain facts or to elicit a particular response. Since *muftīs* are not examiners of the facts, these are taken as they are provided in the questions. Whereas judges are permitted to act on the basis of their own knowledge about cases, *muftīs* are not, unless this information is provided in questions. For these reasons, the opinion to be contained in the *fatwā* is constrained at the outset by the formulation of the question. In addition, in the Ottoman Empire, questions were rewritten by functionaries to facilitate brief answers from the *muftīs*. In theory, questions posed to *muftīs* should pertain to actual events and should not be hypothetical or imaginary. In formulation, however, questions characteristically are presented in generic terms, leaving out details such as place names and using conventional substitutes for actual personal names (e.g., "Zayd" and "'Amr" in Ottoman *fatwās*) or simply "a man" or "a woman." This standard feature in the design of questions underscores the directionality of the *muftī*'s attention, which led away from consideration of the contextual circumstances of a case and toward an assessment of an assumed set of facts in terms of the law.

Muftīs responded to questions received according to their understanding of the contents. Such comprehension frequently depended on the *muftī*'s grasp of both local custom and colloquial expression. In most *fatwā* collections, the incidence of poorly formulated, ambiguous, or otherwise deficient queries has been masked by editorial redrafting of questions or by their omission altogether. According to the theory of the treatises, and also in Ottoman practice, when a question remained unclear, *muftīs* could include explicit caveats in their responses, stating that the value of the answer depended on the information made available in the question. *Muftīs* typically would handle questions touching on the full gamut of *sharīʿah* subject matter, including areas such as contracts and punishments, which usually were also within the jurisdictions of the courts, and areas such as ritual issues, which generally were not. In some historical settings, *muftīs* addressed issues well beyond these strictly legal topics, although some of the early theorists argued that *muftīs* should not respond to questions in certain fields, such as Qur'ānic exegesis or theology. Beyond their responses in matters covered by the *sharīʿah*, Ottoman *muftīs* commonly issued *fatwās* on issues regulated by secular state law. In the early decades of the twentieth century, responding in print to letters his journal received from around the world, Muḥammad Rashīd Riḍā gave *fatwās* on an extremely wide variety of legal, social, and political topics that confronted the Muslims of the day.

While sharing a common identity—as answers to questions—*fatwās* nevertheless took many regional forms depending on local legal cultures and their usages. *Fatwās* from different regions thus vary widely in language, conventional formulas, and rhetorical style. The theoretical treatises suggest proper wording for openings and closings and special terms of address; they also discuss *Allāhu aʿlam*, "God knows best," and other related expressions, one of which appears at the end of most *fatwās*. The treatises also consider the physical organization of *fatwā* texts and recommend against such practices as the leaving of blank spaces or the use of more than one sheet of paper, so as to guard against additions or alterations. Unlike the question, which could be in the hand of the questioner or a secretary, the *fatwā* itself generally had to be written in the authoritative script of the *muftī*. Before actually delivering the *fatwā*, a *muftī* ideally would consult with scholarly colleagues present at the session about his finding. If upon receipt the questioner failed to understand the *fatwā*, he could turn to the *muftī* or individuals in the sitting room for assistance. In some places, further questions could be posed to explore implications or alternatives. If the response of a private *muftī* proved unacceptable, the questioner was free to consult a different *muftī* for another opinion.

Muftīs often were powerful figures. Some "*muftīs*," such as the mid-twentieth-century Lebanese *muftī* of the republic, were actually important political leaders. Others, such as the grand *muftīs* appointed in various states over the past century, have wielded considerable political influence through their official *fatwās*. The heads of the great *fatwā*-issuing bureaucracies, such as the Ottoman *shaykh al-Islām*, were among the highest-ranking state officials. [*See* Shaykh al-Islām.] For the scholarly another form of influence was measured in reputational terms and expressed in estimations of juristic preeminence, which entailed leadership in such activities as writing, instruction, and *fatwā*-giving, and also control of certain tax and endowment revenues. In both political and scholarly communities, doctrinal struggles between opposed states or competing instructional centers have been played out in "*fatwā* wars." Although the theory of private *fatwā*-giving held that *fatwās* should be given for free, gifts and various forms of pious support were common. Official *muftīs*, however, were salaried or received set fees from their questioners, and many grew wealthy in their positions. In historical contexts where there were formal requirements to obtain *fatwās* as part of the litigation process, *muftīs* issued opinions that had direct bearing on court outcomes; in other contexts, approaching a *muftī* amounted to a cheaper, less conflictual, and more efficient alternative means of dispute resolution.

The overall significance of the *fatwā* is twofold. *Fatwās* by leading jurists articulated formal, legal-religious views of important doctrinal questions, societal issues and political events. At this level, *muftīs* employed their creative interpretations of the *sharīʿah* to grapple with the major continuities and changes in Muslim life. The impact of such interpretations, however, depended on the overall place of the *sharīʿah* in their respective societies. On the other hand, the mass of unremarkable *fatwās* issued by *muftīs* official and unofficial, and of diverse schools and statures, has assisted Muslims from all walks of life in efforts to arrange their affairs in accord with the design of the *sharīʿah*.

[*See also* Ijtihād; Law, *article on* Legal Thought and Jurisprudence; Muftī.]

BIBLIOGRAPHY

Heyd, Uriel. "Some Aspects of the Ottoman Fetva." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 32(1969): 35–55. The best examination of the textual features of a *fatwā*-issuing institution.

Ibn Khaldūn. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. 3 vols. Translated by Franz Rosenthal. New York, 1958. Contains an institutional view of official *muftis*, appointed by the imam.

Masud, Muhammad Khalid. "*Adab al-Mufti*: The Muslim Understanding of Values, Characteristics, and Role of a Mufti." In *Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam*, edited by Barbara D. Metcalf, pp. 124–150. Berkeley, 1984. Survey of theoretical manuals concerned with the muftiship.

Messick, Brinkley. *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society*. Berkeley, 1993. An anthropological and textual study of *muftis* in Yemen (see pp. 135–151).

Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā al-. *Adab al-fatwā wa-al-muftī wa-al-mustaftī*. Damascus, 1988. Typical "*adab al-muftī*" treatise concerned with the muftiship, by a thirteenth-century author.

Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs al-. *Al-Iḥkām fī tamyīz al-fatāwā 'an al-aḥkām wa-taṣarrufāt al-qāḍī wa-al-imām*. Cairo, 1989. Comparative analysis of the judge and the *muftī* by a thirteenth-century jurist.

Weber, Max. *Economy and Society*. 2 vols. Berkeley, 1978. Compares *muftis* with Roman jurisconsults (see pp. 798–799, 812–821).

Weiss, Bernard G. *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Dīn al-Āmidī*. Salt Lake City, 1992. On the theory of the interpretive interchange see pp. 717–728.

BRINKLEY MESSICK

Modern Usage

Fatwā emerged as an informal institution long before the formal establishment of the public office of the *muftī*, and its social and political potentials are discernible in the early theoretical discussions of *iftā'* (the act of issuing *fatwās*). The subject of *fatwā* is usually treated in works on the principles of jurisprudence (*uṣūl al-fiqh*) following the section on *ijtihād*. Whereas *ijtihād* refers to the scholarly, intellectual effort of seeking an opinion regarding applied law, *fatwā* refers to the social role of a *mujtahid* as a consultant in matters of law, contrasted with the well-defined role of a *qāḍī* (judge). A *fatwā* is defined as an unbinding legal opinion issued in response to the question of a *mustaftī*. Thus a *muftī* is inherently biased, because he responds to a question presented by only one party to a dispute. Conceding this bias, *uṣūl* works distinguish between the unbinding opinion of a *muftī* and the binding ruling of a judge. Furthermore, it is up to a judge to verify whether a *fatwā* is applicable in a specific case. These differentiations conceptually situate the institution of *fatwā* in an intermediary plane between the theory of law as articulated by *mujtahids* and the practice of law as exercised by judges. As such, a *muftī* contributes both to the ongoing development of the legal doctrine of a school of law and to its practical application.

Before the eleventh century CE a *muftī* was simply someone who issued *fatwās*, knowledge and recognition by the scholarly community were the only prerequisites for a *muftī*. Beginning in the eleventh century a public office of *muftī* was affixed to the private vocation of *iftā'*. In eleventh-century Khurasan, the *shaykh al-Islām* of a city was the official head of its local *'ulamā'*, and functioned as its chief *muftī*. Under the Mamlūks, one *muftī* of each school was appointed as part of the appeal courts of provincial capitals. The Ottomans appointed a *muftī* in each city, integrated *muftīs* into the bureaucratic system, and organized *iftā'* as a routinized state procedure. Under Sultan Murad II (r. 1421–1444, 1446–1451), the once honorific title *shaykh al-Islām* was transformed into the official title of the chief *muftī* of the empire. By the time of Sülayman Kanuni (r. 1520–1566) the office had developed from a part-time occupation into a fully formalized one; Sülayman appointed the *muftī* of Istanbul to the office of *shaykh al-Islām* and made him the head of the religious establishment of the whole empire. The Ottomans thus gave *fatwā* political sanction it had lacked earlier. The *shaykh al-Islām* was appointed and dismissed only by the sultan; the sultan in turn was confirmed or deposed by the shaykh's *fatwā*. The *shaykh al-Islām*, however, still depended on the secular authority and the *qāḍīs* to execute his judgments.

The ambiguity in the actual power of the Ottoman *shaykh al-Islām* gave rise to several theories on the origins of this office. One theory proposes that the office arose in imitation of the Patriarch of Constantinople, but this fails to account for the pre-Ottoman history of the office of the *muftī* in general and of the title *shaykh al-Islām* in particular. A more pertinent question is whether the office was founded to give religious legitimacy to secular authorities, or whether it was founded to coopt the religious institutions in an attempt to bring them under the control of the state. It is probable that the office was initially founded to confer Islamic legitimacy on the state and in recognition of Islam as the main source of social and political cohesion; however, as the Ottomans developed a secure tradition of ruling, the office was formalized and absorbed into the state bureaucracy, and the *shaykh al-Islām* was in effect demoted from a theoretical equal to a definite subordinate of the sultan. [*See* Shaykh al-Islām.]

Parallels to the office of *shaykh al-Islām* existed out-

side the Ottoman Empire, although usually under different titles. In Mughal India, the *ṣadr al-ṣudūr* was the head of the religious corporation, whereas the *shaykh al-Islām* looked after the affairs of the Ṣūfīs. In Ṣafavid Iran, the *shaykh al-Islām* was neither the grand *muftī* nor the head of the religious hierarchy. These functions were reserved for the *ṣadr*, who controlled the religious institutions on behalf of the state and who was in charge of the officially sponsored spread of Shiism. The *ṣadr* was appointed by the state, and was charged with appointing *qāḍīs*, supervising *waqfs*, and functioning as the official head of the *'ulamā'* class. In addition to the *ṣadr*, *shaykhs al-Islām* were appointed by the state in the capital and several other provincial cities and towns. These *shaykhs al-Islām* functioned as the chief religious officials in their areas, and were under the general supervision of the *ṣadr*. They were also in charge of supervising the local *qāḍīs*. The organization of the religious establishment under the Ṣafavids presupposed the religious authority of the rulers as the descendants of the hidden imam (thus the title "shadows of God"). In time, this authority was challenged, and the role of representing the hidden imam was reclaimed by the *mujtahids*. These were independent scholars who filled no office, were not appointed by the state, and were not on its payroll. During the eighteenth century, a theological controversy between two Shī'ī schools, the Uṣūlīs and the Akhbārīs, was resolved in favor of the former. According to the Uṣūlīs, Muslims were under the obligation to choose and follow a living *mujtahid* known as a *marja' al-taqlīd*. Under the Qājārs, the body of *mujtahids* further articulated the claim of collective deputyship of the imam. On account of his knowledge and piety, a *mujtahid* or a *marja'* had the authority to interpret and explain the law to ordinary Muslims. Thus both the Sunnī *muftī* and the Shī'ī *mujtahid* shared the function of interpreting the law. There are, however, some important differences between the two offices. Whereas the *fatwā* of a Sunnī *muftī* was not binding, that of a Shī'ī *mujtahid* was. Moreover, with the passage of time, the Ottoman office of the *muftī* was successfully coopted into the state bureaucracy, while the Shī'ī *mujtahids* gradually gained a greater measure of independence from the ideological and physical control of the state. [*See* Ṣadr; Marja' al-Taqlīd.]

As a result of a gradual bureaucratization of religious institutions in the Islamic world in general, and of the office of the *muftī* in particular, the class of *'ulamā'* came to enjoy greater social prestige, higher and steadier incomes, and improved promotional opportunities. (cial *muftīs*, however, had no monopoly over issuing *wās*, and private *muftīs* did not require govern approval to engage in *iftā'*. Recognition of the semi vate nature of the institution of *iftā'* was even refle in the official appointment of *muftīs*. In the Otto Empire, for example, a *muftī*'s appointment was theo ically for life, and in any case was for a long durat in contrast, the appointments of judges were for c year terms. Moreover, while a judge was a Ḥanafī O man trained in the schools of Istanbul, *muftīs* often longed to the local non-Ḥanafī elites of the cities towns in which they served. These local *muftīs* had l ter knowledge of the conditions and customs of t cities and were often chosen by the local elites and s ply confirmed in office by the central authorities in tanbul.

Owing to its dual private and public traits, the insti tion of *fatwā* evinces a multitude of social manife tions. A formal *fatwā* in response to a formal inqu may serve as a technical tool in the legal proceeding a court, or as a scholarly endeavor through which a st dard legal doctrine is expanded, modified, or develop Alternatively, a *fatwā* may be issued at a scholar's o initiative in the form of a treatise, proclamation, or l son. In any of these forms a *muftī*, scholar, teacher, preacher may give what amounts to a minor or a ma *fatwā*. A minor *fatwā* usually involves one or more the following: the practical application of the law; explanation of the law in complicated cases or to peo who have no direct access to its technical formulatio instructions on correct social behavior or lawful re gious beliefs and practices; or suggestions for settli disputes without further recourse to courts. Such *fatw* contributed to social stability by both providing form administrative organization and informal networks f running the affairs of society.

A major *fatwā*, by contrast, involves a significa statement on public law and policy and may often le to the expansion of the corpus of law. In the Ottom Empire, for example, declarations of war and peace, well as administrative and fiscal measures and reform were sanctioned by the *fatwās* of the *shaykh al-Islā* Not only were *fatwās* used to justify extra-*sharī'ah* la (for example, Ottoman taxation and criminal laws) i sued by the secular authorities, but the authority of t sultan was itself legitimized or denied on the basis such *fatwās*; for example, Sultan Murad V was depos by an 1876 *fatwā* on grounds of insanity. *Fatwās* we

lso used to legitimize new social and economic prac-ces. In the Ottoman Empire, for example, a *fatwā* is-ued in 1727 authorized the printing of nonreligious ooks; vaccination was declared legitimate in an 1845 *atwā*; and several *fatwās* were used to legitimize low-ate interest, selling on credit, and the practice of estab-shing cash *waqf*. *Muftīs* also played a role in curbing he powers of judges and other secular functionaries. By iving voice to the complaints of the people and by pro-iding authoritative articulations of their legal rights, *atwās* often permitted individuals or groups to seek re-ress and justice in courts.

Parties to social and religious conflicts also solicited *atwās* in support of their contentions. In the Ottoman Empire, for example, leaders and members of puritani-al movements often approached *muftīs* for *fatwās* con-lemning Ṣūfī practices. Most of the responses, how-ver, were intentionally moderate. Thus in a famous *atwā* the great Ottoman *shaykh al-Islām* Ebüssu'ûd Mehmet Efendi (Ar., Abū al-Su'ūd Afandī; 1545–1574) ensored Ṣūfī excesses as well as the extreme intolerance of their critics; in the same *fatwā* he confirmed the legit-macy of Ṣūfī music and rhythmic dancing, which were he intended targets of the solicitors of the *fatwā*.

Major transformations engulfed the Muslim world luring the nineteenth and twentieth centuries. The de-line in the centralized power of the Ottoman state and he corresponding increase in European domination over Muslim territory changed the sociopolitical signifi-ance of the institution of *fatwā*. The practical perti-ence of formal *fatwās* diminished owing to the seizure of executive and judicial powers first by European colo-ial administrations and later by the nation-states that nherited the colonial legacies. During this period, how-ver, *fatwās* became tools for mobilizing the population n both active and passive anticolonial resistance and in he struggle for national independence. Anticolonial *fat-wās* focused on defining Islamic territory (*dār al-Islām*) and the territory of war or unbelief (*dār al-ḥarb*, *dār al-kufr*), and on the related question of whether it was obligatory for Muslims to wage war against or emigrate rom *dār al-ḥarb*.

The nineteenth century abounds with examples of uch *fatwās*. In 1804 'Uthmān ibn Fūdī (Usuman Dan Fodio, d. 1817) declared *jihād* in West Africa (present-lay northern Nigeria). Ibn Fūdī justified his declaration of war by arguing that the land was ruled by unbeliev-rs, making it *dār al-ḥarb*; he added that it was obliga-ory for Muslims to emigrate from lands ruled by unbelievers and to participate in the war against them. A year before, the Indian scholar Shāh 'Abd al-'Azīz (d. 1824), the son of the celebrated Indian scholar Shāh Walī Allāh (d. 1762), declared that India under British rule had become *dār al-ḥarb*; his *fatwā* was also justified on the grounds that India was ruled by the laws of non-Muslims. Following his lead, the Mujāhidīn movement under Sayyid Aḥmad Barelwī (d. 1831) declared most of India a land of unbelief and enjoined Muslims to emi-grate to northern India and join the *jihād* against the Sikhs of the northwestern frontier. A similar logic was also employed during the 1857 mutiny, when a *fatwā* was issued by the *'ulamā'* of Delhi justifying *jihād* against British rule. Nonetheless, designating a territory as a land of unbelief did not always lead to the radical reactions of emigration and *jihād*. The Farā'iẓī (Ar., Farā'iḍī) movement of mid-nineteenth-century Bengal, for example, considered India *dār al-kufr*; rather than declaring *jihād*, however, it resorted to the symbolic posture of suspending public rituals (such as the Friday congregational prayers) which presuppose an Islamic political order.

The unrealistic demands of the radical choices of emi-gration and *jihād* were soon widely recognized. For ex-ample, in 1870, the *'ulamā'* of northern India issued *fat-wās* stating that the Muslims of India were not obliged to rebel against the British nor to emigrate from their homes. A similar tension is discernible in the Algerian anti-French rebellion led by 'Abd al-Qādir al-Jazā'irī (d. 1883). During the period of his leadership (1832–1847), 'Abd al-Qādir solicited several *fatwās* from Mālikī and Ḥanafī scholars residing in Algeria and elsewhere re-garding the following questions: the obligation to emi-grate from the French-controlled parts of Algeria and to join the *jihād* against the French; legitimate penalties against Muslims who stay under French rule and those who refuse to take part in the *jihād* against them; and legitimate punitive measures against collaborators and against the Moroccan sultan who, under French pres-sure, turned against 'Abd al-Qādir. Although all re-sponses were sympathetic to the Algerian struggle, they differed on the criteria for designating a land as enemy territory. The variance reflected the difference between the Mālikī school, for which the status of the land fol-lowed the status of the ruler, and the Shāfi'ī and later Ḥanafī schools, for which the main criterion is the abil-ity of individuals to practice Islam. Following the arrest of 'Abd al-Qādir the active resistance against the French subsided, but many Algerians continued to emigrate to

other Muslim countries. To appease the Muslims of Algeria and stop them from leaving the country, French authorities obtained *fatwās* from Shāfiʿī and Ḥanafī Meccan *muftīs*; these stated that Muslims under the rule of unbelievers were not obliged either to fight or to emigrate, as long as they were free to practice Islam without danger to their lives and wellbeing. [*See the biography of* ʿ*Abd al-Qādir*.]

As organized parties started to play a larger role in national politics, pamphlets and declarations often substituted for *fatwās*. In 1937, for example, the Muslim Brotherhood of Egypt published a pamphlet declaring that *jihād* for Palestine became an individual obligation for every Muslim; in 1938 similar statements were issued in Syria and Iraq. The political utility of *fatwās*, however, was not restricted to the declaration of war. On numerous occasions, *fatwās* served as instrumental modes of intervention in the political process. For example, in 1904, the ʿ*ulamā*ʾ of Fez issued a *fatwā* demanding the dismissal of European (especially French) experts hired by the state. In 1907, the ʿ*ulamā*ʾ of Marrakesh issued a *fatwā* deposing the sultan of Morocco for failing to defend the state against French aggression. In both cases the demands were heeded. Equally effective was an 1891 *fatwā* by the Iranian *mujtahid* Mīrzā Ḥasan Shīrāzī, who prohibited smoking as long as the British tobacco monopoly continued. In the twentieth century several other *fatwās* were issued calling on Muslims to boycott un-Islamic pursuits; for example, a 1933 *fatwā* by the ʿ*ulamā*ʾ of Iraq called for boycotting Zionist products. Another famous example is the 1971 proclamation by Ayatollah Khomeini regarding the celebration of the 2,500th anniversary of monarchy in Iran. In this proclamation Khomeini called for boycotting the celebration and stated that "anyone who organizes or participates in these festivals is a traitor to Islam and the Iranian nation." In addition to his call for passive resistance and for rebellion, Khomeini used proclamations and *fatwās* to introduce and legitimize institutions such as the Council for the Islamic Revolution and the parliament of the Islamic Republic of Iran. His most-publicized *fatwā*, however, was issued on 14 February 1989 regarding the book *The Satanic Verses*. In this *fatwā* Khomeini called for the execution of author Salman Rushdie for blasphemy, apostasy, and scornful attack on Islam. The book was banned in most Muslim countries and was condemned by many religious scholars, including those of al-Azhar University in Cairo; the latter, however, added that Rusndie himself could not be condemned to death before having a trial and an opportunity to repent.

The social impact of a *fatwā* depends on the level of a self-imposed commitment by people who are able to abide by the prescriptions of the *fatwā*. This impact is also a function of the credibility and reputation of the *muftī*, the constraints for social and political action, and the responses of the authorities. Historically, *fatwās* have functioned as instruments for the regulation and reconstitution of society. Today, the institution of *fatwā* remains a viable tool through which a society can adjust itself to internal and external social, political, and economic change.

[*See also* Ijtihād; Muftī; Rushdie Affair.]

BIBLIOGRAPHY

Ahmad, Aziz. "The Role of the Ulema in Indo-Muslim History." *Studia Islamica* 31 (1970): 2–13.

Antoun, Richard. *Muslim Preacher in the Modern World: A Jordanian Case Study in Comparative Perspective*. Princeton, 1989. Close examination of the role of preachers in contemporary Muslim society.

Berkes, Niyazi. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal, 1964. Contains useful information on the role of the religious institution in the development of secularism.

Bulliet, Richard W. "The Shaikh al-Islām and the Evolution of Islamic Society." *Studia Islamica* 35 (1972): 53–67. Summary of the earliest uses of the term *shaykh al-Islām*, beginning with eleventh-century Khurasan.

Çağatay, Neş'et. "Ribā and Interest Concept and Banking in the Ottoman Empire." *Studia Islamica* 32 (1970): 53–68. Lists some *fatwās* and court rulings legalizing interest at low rates and the establishment of cash *waqf*.

Gibb, H. A. R., and Harold Bowen. *Islamic Society and the West*. Vol. 1, part II. London, 1950. See especially pages 70–164. Contains a detailed description of the organization of the ʿ*ulamā*ʾ class in the Ottoman Empire, and on the position of Shaykh al-Islām within the religious and administrative hierarchy.

Hallaq, Wael B. "From Fatwās to Furūʿ: Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society*, Special Sample Issue (1993): 1–33. Makes a strong case for the responsibility of the *muftī* in the development of legal doctrine.

Heyd, Uriel. "Some Aspects of the Ottoman Fetva." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 32 (1969): 35–55. Classical study of *fatwās* in the Ottoman Empire.

Inalçik, Halil. *The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300–1600*. London, 1973. The best social history of the Ottoman Empire for the period 1300–1600, with sections on the structure of Ottoman religious and bureaucratic hierarchies.

Jennings, R. C. "Kadi, Court, and Legal Procedure in Seventeenth-Century Ottoman Kayseri." *Studia Islamica* 48 (1978): 133–172, and 50 (1979): 151–184. Contains detailed description of *fatwās* and their role in court proceedings and in the social life of an Ottoman city.

Keddie, Nikkie R., ed. *Scholars, Saints, and Sufis*. Berkeley, 1972.

ফতওয়া ঃ গুরুত্ব ও প্রয়োজন

১। ফতওয়ার সংজ্ঞা

আভিধানিকভাবে 'ফতওয়া' শব্দটি ক্রিয়া বিশেষ্য, এর অর্থ ফতওয়া দেয়া (রায় দেয়া অবহিত করা, জানানো)। এর বহুবচন হলো, ফাতাওয়া (فتوى) ফাতাবী (فتاوى যেমন বলা হয়, তাকে তুমি ফতওয়া প্রদান করেছো। বিধানের জটিলতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করাকে ফুত্ইয়া বলা হয়। কারো নিকট পারস্পরিক বিষয়ে ফতওয়া জানার জন্য যাওয়া অর্থ হলো, তার নিকট বিরোধ মীমাংসার জন্য যাওয়া এবং তার নিকট ফতওয়ার বিষ উথাপন করা। তাফাতী অর্থ ঃ মোকদ্দমা করা। বলা হয়, অমুক ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখেছে আ তার ফতওয়া দিয়েছি অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছি (লিসানুল আরাব ও কামূসুল মুহীত) যেমন অতীতের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণীঃ "হে পারিষদবর্গ! আমাকে আমার স্বপ্নে ব্যাখ্যা বলো" (সূরা ইউসুফ ঃ ৪৩)।

ইস্তিফতার আভিধানিক অর্থ হলো, জটিল কোন বিষয়ের সমাধান চাওয়া। যেমন আল্লাহ্ বাণী ঃ "এদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না" (সূরা কাহ্ফ ঃ ২২)।

এটি কখনো শুধু জিজ্ঞাসা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্র বাণীঃ "তাদের জিজ্ঞে করো, তারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি তা" (সূরা আস্-সাফ্ফাত ঃ ১১)।

তাফসীরকারগণ বলেন, ফতওয়ার পারিভাষিক অর্থ হলো ঃ কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধান সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা" (শারহুল মুন্তাহা, ৩ খ ৪৫৬; আনসারুস সুন্নাহ, কায়রো থেকে মুদ্রিত; ইবনে হামদান, সিফাতুল ফাত্ওয় ওয়াল-মুস্তাফতী, পৃষ্ঠা ৪)। বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও ফতওয়া অন্তর্ভুক্ত।

মুফতীর আভিধানিক অর্থ

শব্দটি আফতা (أفتى) ক্রিয়ার কর্তৃবাচক বিশেষ্য। যে ব্যক্তি একবার ফতওয়া প্রদান কে তাকেও মুফতী বলা হয়। তবে শরীয়াতের পরিভাষায় মুফতী শব্দটি এর চাইতেও সুনির্দি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সায়রাফী বলেন, মুফ্তী বিশেষ্যপদটি সেই ব্যক্তির জন্য গঠিত হয়েছে যে মানুষের দীনি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানে নিয়োজিত, যিনি কুরআনের 'আম' (সাধার বিধান), 'খাস' (নির্দিষ্ট বিধান), 'নাসিখ' (রহিতকারী) ও 'মানসূখ' (রহিত) সম্পর্কেও জ্ঞা এবং সুন্নাহর জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তিও তার রয়েছে এবং তিনি মাসআলা বা সমস্যার প্রকৃ অবস্থাও উপলব্ধি করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি একটি মাসআলা জেনেছে এবং অবস্থাও অনুধাব

করতে পেরেছে, তার জন্য মুফতী বিশেষ্যটি গঠিত হয়নি। যে ব্যক্তি (জ্ঞানের দিক দিয়ে) উপরোক্ত পর্যায়ে পৌছবে তাকেই মুফতী বলা হবে। আর যিনি মুফতীর এইসব যোগ্যতা অর্জন করবেন তিনিই উত্থাপিত সমস্যাবলীর ফত্ওয়া প্রদান করবেন (আল-বাহরুল মুহীত, ৬ খ, ৩০৫)।

আল্লামা যারকাশী বলেন, যিনি শরীয়াতের সম্যক জ্ঞান রাখেন তিনি হলেন মুফতী। এটা তখনই হবে যদি আমরা বলি ইজতিহাদ হলো একটি অবিভাজ্য বিষয়।

২। (ফতওয়ার সাথে) সংশ্লিষ্ট শব্দাবলী

(ক) আল-কাদা (বিচার, ফয়সালা)

আল-কাদা ঃ বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে 'কাদা' বলে। একে আল-হুক্ম (বিচার, ফয়সালা)-ও বলা হয়। আল-হাকিম অর্থ আল-কাযী (বিচারক)।

কাদা (রায়) ফতওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে উভয়টির মধ্যে কতগুলো পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ

(১) ফত্ওয়া হলো, শরীয়াতের বিধান অবহিত করা। আর কাদা হলো, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে রায় প্রদান করা বা ফয়সালা করা।

(২) ফতওয়া প্রার্থনাকারী বা অন্য কারো জন্য ফত্ওয়া মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক নয়। বরং ফতওয়া প্রার্থনাকারী মুফতী প্রদত্ত ফত্ওয়া সঠিক মনে করলে তা গ্রহণ করবে অথবা এ ফত্ওয়া পরিত্যাগ করে অন্য কোন মুফতী থেকেও ফত্ওয়া নিতে পারে। পক্ষান্তরে বিচার বিভাগীয় ফয়সালা মান্য করা বাধ্যতামূলক (ইলামুল মুআক্কিঈন, ১ খ, ৩৬, ৩৮; ৪ খ, ২৬৪; আল-ইহকাম ফী তামঈযিল ফাত্ওয়া মিনাল আহকাম লিল-কাররাফী, পৃষ্ঠা ২০, হালাব-মাকতাবাহ আল-মাতবূআত আল-ইসলামিয়া, ১৩৮৭ হিজরী)। উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে বলা যায়, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কোন একজন অপরজনকে ফিক্হ বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে ফত্ওয়া নেয়ার আহবান জানালে তাকে আমরা (ফত্ওয়া নিতে) বাধ্য করতে পারি না। কিন্তু তাকে বিচারকের ফয়সালা গ্রহণ করার আহবান জানালে সে আহবানে সাড়া দেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক এবং তাকে এজন্য বাধ্য করা যাবে। কেননা বিচারক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার দায়িত্বে নিয়োজিত (আল-বাহরুল মুহীত লিয-যারকাশী, ৬/৩১৫, কুয়েত, ওয়াক্ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হিজরী)।

(৩) দুররে মুখতারের গ্রন্থকার আইমান আল-বাযযাযিয়া থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ মুফতী ধার্মিকতার সাথে ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের ভিত্তিতে ফতওয়া দিবেন এবং ফতওয়াপ্রার্থীকে

ধার্মিকতার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করবেন। আর বিচারক রায় দিবেন প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, যেমন কোন লোক মুফতীকে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি "তুমি তালাক এবং এটাকে মিথ্যা বক্তব্য হিসাবে গণ্য করেছি"। এতে মুফতী তালাক হয়নি মর্মে ফতওয়া প্রদান করবেন। পক্ষান্তরে কাযী তালাক হওয়ার রায় প্রদান করবেন (রদ্দুল মুহতার 'আলাদ-দুররিল মুখতার, ৪ খ, ৩০৬)।

(৪) আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, বিচারকের রায় হলো আনুষঙ্গিক ও নির্দিষ্ট যা বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর মুফতীর ফতওয়া হলো একটি সাধারণ নির্দেশ যা ফতওয়া তলবকারী ও অন্যান্যদের সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে। কাযী বা বিচারক নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রায় প্রদান করেন। আর মুফতী সামগ্রিক ও ব্যাপক বিধানগত ফত্ওয়া প্রদান করেন। যেমন বলা যায়, যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার ওপর এরূপ হুকুম বর্তাবে; যে ব্যক্তি এরকম কথা বলবে তার জন্য এটা বাধ্যতামূলক হবে (ইলামুল মুআক্কিঈন, ১/৩৮)।

৫। রায় (ফয়সালা) কেবল কথার মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। আর ফতওয়া লিখিতভাবে, কাজের মাধ্যমে এবং ইঙ্গিতেও হতে পারে (আল-ফুরূক লিশ-শায়খ আহমাদ ইবনে ইদরীস কাররাফী আস্- সানহাজী আল-মালেকী, ৪/৪৮, ৫৪)।

(খ) ইজতিহাদ

ইজতিহাদ ঃ শরী'আতের ধারণা বা গভীর চিন্তাপ্রসূত বিধান অর্জন করার জন্য ফিক্হ বিশারদগণের যথাসাধ্য প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে।

৩। ইজতিহাদ ও ফতওয়ার মধ্যে পার্থক্য

অকাট্যভাবে অথবা ধারণা প্রসূতভাবে জ্ঞাত বিষয়ের ক্ষেত্রে ফতওয়া প্রদান করা যায়, কিন্তু অকাট্য বিষয়ে কোন ইজতিহাদ করা যায় না (মুসাল্লামুস্ সুবূত ফী উসূলিল ফিক্হ, ২/৩৬২, বূলাক; আল-ইহকাম লিল-কাররাফী, পৃ. ১৯৫)। ফিক্হ বিশারদের অন্তরে শরীয়াতের বিধান অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে কেবল ইজতিহাদ সম্পন্ন হতে পারে। অর প্রশ্নকারীকে শরীয়াতের বিধান জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কেবল ফতওয়া সম্পন্ন হতে পারে। যারা বলেন, মুজতাহিদ-ই হলেন মুফতী, তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, মুজতাহিদ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে মুফতী হওয়া যায় না। মুফতী হতে হলে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে। ফত্ওয়া ও ইজতিহাদকে অর্থের দিক থেকে একাকার করে ফেলা তাদের উদ্দেশ্য নয় (আল-ওয়ারাকাত লিল-জুওয়ায়নী ওয়া

শারহুহা লি-ইবনে কাসিম আল-আদী বিহামিশ ইরশাদুল ফুহূল, পৃষ্ঠা ২৪৭; শাওকানী, ফী ইরশাদিল ফুহূল, পৃ. ২৬৫; সিফাতুল ফাতাওয়া লি-ইবনে হামদান, পৃষ্ঠা ১৩)।

৪। ফতওয়া প্রদান বাধ্যতামূলক কিনা

ফতওয়া প্রদান করা ফরযে কিফায়া। কেননা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক থাকা জরুরী যিনি তাদের দীনি বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। আর প্রত্যেকের পক্ষে এ কাজ করা সহজ নয়। অতএব এ কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তিই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

ফতওয়া প্রদান করা ফরযে আইন নয়। কেননা ফতওয়া প্রদান করার জন্য ব্যাপক ইলম হাসিল করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যদি এটা ফরয করে দেয়া হতো, তাহলে মানব জীবনের অন্যান্য কার্যাবলী ও বিভাগসমূহ অকেজো হয়ে যেতো। কারণ তখন লোকদের ফতওয়া প্রদানের জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হতো এবং ফতওয়া সংক্রান্ত ইলম ব্যতীত অন্যান্য কল্যাণকর জ্ঞানার্জন করা থেকে বিরত থাকতে হতো। ফতওয়া প্রদান করা ফরযে কিফায়া হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "আর আল্লাহ যখন কিতাবধারীদের নিকট থেকে অঙ্গিকার নিলেন যে, তারা তা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৮৭)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার জ্ঞাত ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে" (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি, হাসান ও সহীহ্)।

মুহাল্লী বলেন, নিম্নোক্ত কাজসমূহ ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত ঃ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করা, দীনের জটিল বিষয়সমূহের সমাধান পেশ করা, সংশয় দূর করা এবং শরীয়াতের ইলম পেশ করা। যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান যাতে প্রয়োজনে বিচার-ফয়সালা ও ফতওয়া প্রদান করার উপযুক্ত হওয়া যায় (শারহুল মিনহাজ লিল-মুহাল্লী, ৪/২১৪)।

দেশে কিছু সংখ্যক মুফতী থাকা অপরিহার্য, যেন তাদেরকে সাধারণ মানুষ চিনতে পারে। প্রয়োজনে লোকেরা নিজেদের দীনি সমস্যার সমাধানের জন্য তাদের নিকট গিয়ে ফতওয়া জেনে নিবে। একটি দেশে কতজন মুফতী থাকা প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে শাফিঈ মাযহাবের অভিমত হলো, প্রতি সফরের দূরত্বে (অর্থাৎ প্রতি ৪৮ মাইলের মাথায়) একজন করে মুফতী থাকবেন (শারহুল মিনহাজ, ৪/২১৪)।

৫। মুফতী নির্দ্ধারণ

ফত্ওয়া প্রদানের যোগ্য কোন ব্যক্তি শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে তিনি ফতওয়া প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যান (অর্থাৎ ফতওয়া প্রদান করা তার ওপর জরুরী হয়ে পড়ে)। শর্তসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রথম ঃ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফতওয়া প্রদানের উপযুক্ত কোন আলিম না থাকলে কাছাকাছি এলাকায় যিনি থাকবেন তিনি ফতওয়া দিবেন। যদি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফতওয়া প্রদানের উপযুক্ত কোন আলেম থাকেন তাহলে পূর্বোক্ত আলেম ফতওয়া প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট হবেন না (শারহুল মুনতাহা, ৩/৪৫৮, যমীরিয়া লাইব্রেরী)। বরং তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার আলেমের নিকট প্রশ্নকারীকে পাঠাতে পারেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশজন আনসার সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি। তাদের একজনকে একটি মাস্আলা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি আরেকজনের নিকট পাঠালেন, তিনি পাঠালেন তৃতীয় জনের নিকট। এভাবে মাস্আলাটি ঘুরেফিরে প্রথম ব্যক্তির নিকট এলো। কেউ কেউ বলেন, অন্য কোন আলেমের নিকট ফত্ওয়া চাওয়ার জন্য যদি না যায়, তাহলে প্রথম ব্যক্তিই ফতওয়া প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবেন (আল-মাজমূ লিন-নাবাবী শারহুল মুহাযযাব লিস্-শীরাযী, ১/৪৫, কায়রো, মনীরিয়া লাইব্রেরী)।

দ্বিতীয় ঃ প্রশ্নের উত্তরদাতাকে বিধান সম্পর্কে কার্যক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হতে হবে অথবা ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছাকাছি যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় জওয়াবদানে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে তাকে জবাব তৈরীর জন্য কষ্টস্বীকার করতে হবে।

তৃতীয়ঃ মুফতীর ফতওয়া দেয়া অপরিহার্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকতে পারবে না। যেমন অবাস্তব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অথবা এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাতে প্রশ্নকারীর কোন উপকার নেই অথবা অনুরূপ কোন কিছু (আল-মুয়াফিকাত, ৪/৩১৩)।

৬। ফতওয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব

ইসলামী শরীয়াতে ফতওয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা কয়েকটি দিক থেকে নির্ণীত হয়। যেমন ঃ

(ক) আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদেরকে ফত্ওয়া প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ "আর লোকজন তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৭)।

তিনি আরো বলেনঃ "লোকজন তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)।

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় ফত্ওয়া প্রদানের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। এ মহান দায়িত্ব তিনি নবুওয়াতের দাবি অনুসারেই পালন করেছেন। মহান আল্লাহ-ই তাঁকে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ "এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে" (সূরা আন্-নাহলঃ ৪৪)।

অতএব মুফতী কুরআন ও হাদীসের বিধান বর্ণনা করার মহান দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা বা প্রতিনিধি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা) ফত্ওয়া প্রদানের মহান দায়িত্ব পালন করেন। তাদের পরে এ দায়িত্ব পালন করেন বিজ্ঞ আলেমগণ।

(গ) ফতওয়ার বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ বর্ণনা করা এবং মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে তার বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন। অতএব ফতওয়া হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রশ্নকারীকে একথা বলে দেয়া যে, "এটা করা তোমার কর্তব্য" অথবা "এটা করা তোমার জন্য হারাম"। এ কারণেই আল্লামা কাররাফীর মতে মুফ্তী হলেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের ভাষ্যকার সমতুল্য। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম মুফ্তীকে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে স্বাক্ষরকারী (প্রতিনিধিত্বকারী) মন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব সবারই জানা, কেউ তা অস্বীকার করে না। প্রচলিত নিয়ম-নীতিতে তার সম্মান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ। তাহলে (মুফ্তী) যিনি মহাবিশ্বের পালনকর্তার প্রতিনিধিত্বকারী, তার মর্যাদা কত বেশী (ইলামুল মুআক্কিঈন, ১/১০)! ইমাম নববী লিখেছেন, মুফ্তী মহান আল্লাহ্র পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী। ইবনুল মুনকাদির বর্ণনা করেছেন, আলেম ব্যক্তি হলেন আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে অবস্থানকারী। কাজেই তার চিন্তা করে দেখা উচিত যে, তিনি কিভাবে উভয়ের মাঝে প্রবেশ করবেন (মুকাদ্দিমা আল-মাজমূ, ১/৭৩)।

৭। ফতওয়া প্রদানে সতর্কতা ও বেপরওয়া ভাব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে জাহান্নামের আগুনকে যে ভয় পায় না সে ফত্ওয়া প্রদানে বেপরওয়া হতে পারে" (দারেমী, ১/৫৭)। ইতিপূর্বে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সমীহ করতেন।

ইমাম নববী তার হাদীস গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি আরো যোগ করেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কোন হাদীস বর্ণনা করার সময় আশা করতেন যে, এ হাদীস যদি তিনি ছাড়া অপর কোন ভাই বর্ণনা করতেন! আর কোন বিষয়ে কোন ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতেন, যদি তার অপর কোন ভাই ফত্ওয়াটি প্রদান করতেন তবে তার পক্ষ থেকে সেটাই যথেষ্ট হতো। সুফিয়ান ও সাহনূন থেকে বর্ণনা করা হয়েছেঃ ইলম যার যতো কম ফত্ওয়া প্রদানের ব্যাপারে সে ততো বেশী দুঃসাহসী ও বলগাহীন হয়। কাজেই আলেমের উচিত, ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। তবে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে অথবা যে বিষয়ে ইজমা রয়েছে সে বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করবেন। এছাড়া যেসব বিষয়ে পরস্পর বিরোধী উক্তি ও দিক রয়েছে এবং যেসব বিষয়ের হুকুম অস্পষ্ট সেসব বিষয়ে জবাব স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালানো কর্তব্য। দলীল-প্রমাণ দ্বারা জবাব স্পষ্ট না হলে জবাব বা ফত্ওয়া প্রদান করা থেকে বিরত থাকবেন।

ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'একদা তাকে পঞ্চাশটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি একটিরও জবাব দেননি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রশ্নের জবাব বা ফত্ওয়া প্রদান করবেন তার উচিত ফতওয়া প্রদান করার পূর্বে নিজেকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা এবং জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বের করে নেয়া, অতঃপর জবাব প্রদান করা।' আসরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে অধিকাংশ প্রশ্নের জবাবে "আমি জানি না" বলতে শুনেছি (আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব, ১/৪০-৪১)।

৮। অজ্ঞতা প্রসূত ফতওয়া

অজ্ঞতা প্রসূত ফত্ওয়া প্রদান করা হারাম। কেননা এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার শামিল। এটা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ ও অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি, এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না" (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩৩)।

অত্র আয়াতে ইলম ছাড়া অজ্ঞতা প্রসূত ফতওয়া প্রদানকে অশ্লীলতা, অন্যায়, অত্যাচার ও শিরকের সমতুল্য বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আল্লাহ

তাআলা আলেমগণের হৃদয় থেকে ইলম অপসারণ করার মাধ্যমে (দুনিয়া থেকে) তা তুলে নেননা। তিনি আলেমগণের মৃত্যুদানের মাধ্যমে (দুনিয়া থেকে) ইলম উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। অবশেষে বিজ্ঞ আলেমের অভাবে লোকেরা অজ্ঞ লোকদেরকে নেতা বানিয়ে নিবে। তখন তারা (জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হয়ে ইলম ছাড়া ফতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও বিপথগামী হবে এবং জনগণকেও বিপথগামী করবে" (বুখারী থেকে ফাতহুল বারী, ১/১৯৪; মুসলিম, ৪/২০৫৮)।

এ কারণে সালাফে সালেহীন (পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম) থেকে বিস্তর বর্ণনা রয়েছে, তাদের কেউ অজানা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে জবাবে তিনি প্রশ্নকারীকে বলতেন, এ বিষয়ে "আমার জানা নেই"। বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে উমার (রা), ইমাম কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, শা'বী ও ইমাম মালেক (র) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। অজানা বিষয়ে (আমার জানা নেই) এরূপ জবাব দেয়া এবং এরূপ জবাব দেয়ার মানসিকতা তৈরি করা মুফতীদের জন্য বাঞ্ছনীয়। ফত্ওয়া তলবকারী মুফ্তীর ফত্ওয়ার ভিত্তিতে যদি কোন হারাম কাজ করে অথবা কোন ফরয ইবাদত বাতিল (ফাসিদ) পন্থায় সম্পন্ন করে, তাহলে এর গুনাহ ইলম ছাড়া ফতওয়া প্রদানকারী মুফতীর উপর বর্তাবে, যদি ফতওয়া তলবকারী ফত্ওয়া প্রদানের যোগ্য লোক তালাশ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি না করে থাকে। অবশ্য সে যদি এ ব্যাপারে ত্রুটি করে থাকে, তাহলে এর গুনাহ ফতওয়া তলবকারী ও মুফতী উভয়ের উপর বর্তাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি অজ্ঞতা প্রসূত ফতওয়া প্রদান করে (বিনা ইলমে) ফতওয়া প্রদান করার গুনাহ তার উপরই বর্তাবে" (হাকেম ঃ ১/১২৬)।

৯। ফত্ওয়ার বিষয়বস্তুর প্রকারভেদ

ফতওয়ার বিষয়বস্তুর আওতায় বিশ্বাসগত (আকীদাগত) বিধানও অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং ঈমানের অন্যান্য সমস্ত রুকন (মূল বিষয়)।

আমলগত (বাস্তব কর্মের সাথে সম্পৃক্ত) সমস্ত বিষয়ও ফত্ওয়ার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন সমস্ত প্রকার ইবাদত, মুয়ামালাত (পারস্পরিক আদান-প্রদান), শাস্তির বিধান, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি। ফতওয়ার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে আহকাম তাকলিফিয়া (পালনীয় বিধানসমূহ), যেমন ওয়াজিব, হারাম, হালাল, মাকরূহ এবং মুবাহ বিষয়। ফতওয়ার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে বিধিবদ্ধ বা প্রণীত বিধানসমূহও, যেমন ইবাদত সঠিক হলো কি না লেনদেন, কর্মকাণ্ড সঠিক হলো কি না এ সবই ফতওয়ার বিষয়বস্তুর মাঝে গণ্য হবে।

১০। মুফতীর বাস্তব কাজ

যেহেতু ফত্ওয়া হলো দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে অবহিত করা, সেহেতু এতে কতিপয় পালনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী ঃ

(ক) স্বয়ং মুফতীকেই শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যে জ্ঞান অর্জন করা কষ্টসাধ্য নয় তা অর্জনের তেমন গভীর চেষ্টাও লাগে না। যেমন কোন প্রশ্নকারী ইসলামের রুকন সম্পর্কে প্রশ্ন করলো অথবা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। আর যদি দলীল-প্রমাণ সূক্ষ্ম হয়, যেমন হয়তো কুরআনের কোন আয়াতের বক্তব্য স্পষ্ট নয় অথবা নবী করীম (স)- এর খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস বা যে হাদীসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয় অথবা এমন বিধান যে ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দলীল রয়েছে অথবা বিষয়টি মূলত কুরআন ও হাদীসের কোন দলীল-প্রমাণের আওতায় পড়ে না, এই অবস্থায় বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণের যথার্থতা প্রতিপাদন করতে বা বিধান নির্গত করতে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে বা কিয়াস (সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের আলোকে বিধান নির্গত) করতে হবে।

(খ) ফতওয়া প্রার্থনাকারী তার প্রশ্নের মধ্যে যে ঘটনার উল্লেখ করবে সেই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। মুফতী সাহেব যেন বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে জেনে নেন যা তার জওয়াবের সাথে জড়িত, যাতে প্রশ্নকারীকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে তিনি অন্যদের নিকটও জিজ্ঞেস করবেন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ও বিবেচনায় রাখবেন।

(গ) জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সাথে শরীয়াতের বিধানের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি অবগত হওয়া। যেন তার মনে শরীয়াতের যে বিধান জানা রয়েছে তা জিজ্ঞাসিত ঘটনার উপর প্রয়োগে সক্ষম হন। কেননা শরীয়াতে প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দলীল নির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয়নি, বরং আম (সাধারণ) বিষয়ে দলীল বলে দেয়া হয়েছে, যা থেকে অনেক অসংখ্য বিষয়ের দলীল পাওয়া যেতে পারে। আবার প্রতিটি ঘটনার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা অন্য ঘটনায় নেই। আবার ঘটনাবলীতে শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে সব বৈশিষ্ট্যই গ্রহণীয় নয়, আবার বর্জনীয়ও নয়, বরং কিছু গ্রহণযোগ্য, কিছু বর্জনীয়, আবার কিছু সংখ্যক বৈশিষ্ট্য আছে যা যে কোন একদিকে প্রযোজ্য হতে পারে। এমতাবস্থায় মুফতী সাহেবের জন্য অবস্থা হয় সহজ হবে, না হয় কঠিন হবে, যেন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি কোন দলীলের আওতায় পড়বে এবং এতে শরয়ী বিধান প্রয়োগ করার পথ রয়েছে কিনা। যদি তা তাতে বিদ্যমান পাওয়া যায় তাহলে তাতে বিধানটি প্রয়োগ করবেন। আর এটিই হচ্ছে ইজতিহাদ (গবেষণা) যা

FÉDÉRATION NATIONALE DES MUSULMANS DE FRANCE

Contains several useful articles on the social and political role of the '*ulamā*' in various periods and regions. See, in particular, the articles by Richard L. Chambers, "The Ottoman Ulema and the Tanzimat"; Aziz Ahmad, "Activism of the Ulama in Pakistan"; Edmund Burke, III, "The Moroccan Ulama, 1860–1912"; and Hamid Algar, "The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran."

Khomeini, Ruhollah al-Musavi. *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*. Translated and annotated by Hamid Algar. Berkeley, 1981.

Lambton, Ann K. S. "The Tobacco Regie: Prelude to Revolution." *Studia Islamica* 22 (1965): 119–157, and 23 (1965): 71–90. Contains a detailed account of the 1891 *fatwā* outlawing smoking as long as the British tobacco monopoly remained.

Lambton, Ann K. S. "A Nineteenth-Century View of Jihād." *Studia Islamica* 32 (1970): 181–192. Brief exposition of conceptual developments in Shīʿī political theory and the resulting change in the Shīʿī concept of *jihād*.

Lambton, Ann K. S. *Theory and Practice in Medieval Persian Government*. London, 1980. The second and third chapters in this book, entitled "*Quis custodiet custodes*: Some Reflections on the Persian Theory of Government," are especially useful on the structure of Shīʿī religious hierarchy in Ṣafavid Iran.

Peters, Rudolph. *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*. The Hague, 1979. Extremely useful reference work containing accounts of the major *fatwās* used for active or passive resistance in the nineteenth- and twentieth-century Sunnī world.

Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. *Al-Maḥṣūl fī ʿIlm al-Uṣūl*. Edited by T. J. F. al-ʿAlwānī. 2d ed. Beirut, 1992. Volume 2, part 3 contains a classical theoretical discussion of *ijtihād* (pp. 7–92) and *fatwā*, *muftī*, and *mustaftī* (pp. 93–128).

Repp, R. C. *The Müfti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy*. London, 1986. Includes a summary and discussion of theories on the rise of the office of Shaykh al-Islām.

Walsh, J. R. "Fatwā." In *Encyclopaedia of Islam*, new ed., vol. 3, pp. 866–867. Leiden, 1960–.

Zilfi, Madeline C. *The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age, 1600–1800*. Minneapolis, 1988.

AHMAD S. DALLAL

প্রত্যেক মুফতী বা কাজীকে অনুশীলন করতে হবে। যদি আমরা ধরে নেই যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে তিনি লোকদেরকে শরয়ী বিধান জানাতে পারবেন না এবং বিধান অজ্ঞাতই থেকে যাবে। কেননা, হুকুমগুলো ব্যাপকার্থক এবং সাধারণভাবে এসেছে, কোন নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু প্রতিটি ঘটনাই সুনির্দিষ্ট। এর বিধান সুনির্দিষ্ট করতে হলে ঘটনা পরম্পরাও জানতে হবে। অতঃপর লক্ষ্য করতে হবে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সাধারণ নির্দেশের আওতায় আসে কি না। তবে এ কাজ কখনো সহজ হতে পারে আর কখনো সহজ নাও হতে পারে, আর এ সবই হল ইজতিহাদ। এর উদাহরণ হলোঃ যেমন কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, তার উপর কি তার পিতার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব?

এক্ষেত্রে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে বিদ্যমান দলীল-প্রমাণের দিকে। তাহলে জানা যাবে যে, শরীয়াতের বিধান হলো ধনী সন্তানের উপর দরিদ্র পিতার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব। অতঃপর জানতে হবে পিতা ও পুত্রের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে, তাদের কে কি পরিমাণ সম্পদের মালিক? তার উপর কি পরিমাণ ঋণ রয়েছে এবং তার পোষ্য কতজন, এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ও জানতে হবে যা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এরপর প্রত্যেকের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যা শরীয়াতের বিধান কার্যকরী করার পথ বা সূত্র, তা হলো "প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য"। কেননা প্রাচুর্য ও দরিদ্রতার সাথে শরীয়াতের বিধান সম্পৃক্ত। এর আবার দুইটি দিক ও মধ্যমাবস্থা রয়েছে। যেমন প্রাচুর্যের একটি উর্ধদিক আছে যাতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে ধনী। আর নিম্নদিক এই যে, অন্তত এই পরিমাণ মাল না থাকলে কোন ব্যক্তি ধনীর আওতাভুক্ত হবে না। আর মধ্যম অবস্থা এই যে, তাতে দেখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধনীর আওতায় পড়ে না তার নিচে নেমে যায়। তেমনিভাবে দরিদ্রতারও তিনটি দিক রয়েছে। সুতরাং মুফতী সাহেব ইজতিহাদ করবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোন পর্যায়ে নেয়া যায়। তার উপর ভিত্তি করে তিনি হুকুম বা ফয়সালা দিবেন।

প্রতিটি ঘটনায় এ ধরনের ইজতিহাদ অবশ্যই অপরিহার্য। একেই বলা হয় তাহকীকুল মানাত, বাস্তবায়নের পদ্ধতি বা লক্ষণ পর্যালোচনা। কেননা উদ্ভূত প্রতিটি ঘটনা নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, এর কোন নজির নেই। যদি ধরে নেই যে, এ ধরনের কোন ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে তাহলে দেখতে হবে যে; এটা ঠিক সেই ধরনেই ঘটনা কিনা। আর সেটাও ইজতিহাদের বিষয়।

১১। মুফতী হওয়ার শর্তাবলী

ফকীহগণের ঐক্যমত অনুযায়ী স্বাধীন হওয়া, পুরুষ হওয়া বা বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া মুফতী হওয়ার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং কৃতদাস, মহিলা ও বাকশক্তিহীন লোকের ফতওয়া প্রদান বৈধ। লিখিতভাবে অথবা আকার-ইংগীতে ফতওয়া প্রদান করা যাবে (শারহুল মুনতাহা, ৩/৪৫৭; ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২২; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৪/৩০২ ও সিফাতুল ফাতওয়া, ইবনে হামদান, পৃ. ১৩; আল-মাজমু, ১/৭৫)।

তবে শ্রবণশক্তির অধিকারী হওয়ার বিষয়ে কোন কোন হানাফী ফকীহ বলেছেন যে, এটা একটা শর্ত। সুতরাং বধির যিনি আদৌ শোনেন না তার ফতওয়া প্রদান বৈধ হবে না। ইবনে আবেদীন বলেন, যদি তাকে প্রশ্ন লিখে দেওয়া হয় এবং তিনি তার জবাবদান করেন তবে নিঃসন্দেহে তার ফতওয়া অনুসারে কাজ করা জায়েয। তবে তাকে ফতওয়া প্রদানের দায়িত্বে নিযুক্ত করা ঠিক হবে না। কারণ প্রত্যেকের প্রশ্ন লিখে দেওয়া সম্ভব নয় (আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, ৪/৩০২)। হানাফীগণ ব্যতীত এ শর্তটি আর কেউ উল্লেখ করেননি। তেমনি তারা শর্তাবলীর মধ্যে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়ার কথাও উল্লেখ করেননি। সুতরাং অন্ধ লোকের ফতওয়া প্রদান করা জায়েয। মালিকী ফকীহগণ এর পক্ষে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন (হাশিয়াতুদ্ দাসূকী, ৪/১৩০)।

১২। তবে মুফতীর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত থাকা জরুরী তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ইসলাম (অর্থাৎ মুসলমান হওয়া)। অতএব কাফির ব্যক্তির ফতওয়া বৈধ নয়।

(খ) বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগলের ফতওয়া প্রদান বৈধ নয়।

(গ) বালেগ হওয়া। নাবালেগের ফতওয়া দেওয়া বৈধ নয়।

১৩। (ঘ) ন্যায়পরায়ণতাঃ গরিষ্ঠ সংখ্যক (জমহুর) আলেমের মতে পাপাচারীর (ফাসেক) ফতওয়া বৈধ নয়। কারণ ফতওয়া হচ্ছে শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে অবগত করা। আর পাপাচারীর সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কেউ কেউ পাপাচারীর নিজের জন্য তার ফতওয়াদানকে জায়েয বলেছেন। কারণ সে নিজের সততা সম্পর্কে সম্যক অবগত (সিফাতুল ফাতওয়া, ইবনে হামদান, পৃ ২৯; আল-মাজমু, ১/৪১)।

কোন কোন হানাফী আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, পাপাচারী মুফতী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কারণ সে নিজেকে নির্ভুল প্রমাণ করার জন্য ইজতিহাদ (আপ্রাণ চেষ্টা) করবে (মাজমাউল আনহুর, ২/১৪৫)।

ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ পাপাচারীর ফতওয়া প্রদান করা বৈধ হবে। কিন্তু সে যদি নিজেকে ফাসেক বলে ঘোষণা দেয় অথবা নিজের বিদআতের প্রতি আহ্বান জানায় তবে তার ফতওয়া প্রদান জায়েয নয়। এটা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন পাপাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে শরীয়াতের বিধান অকেজো হয়ে পড়বে। আসলে জরুরী বিষয় হচ্ছে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা (ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২২;, শারহুল মুনতাহা, ৩/৪৫৭; ইবনে আবেদীন, ৪/৩০১)।

বিদআতপন্থীদের ফতওয়ার ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, যদি তাদের বিদআত ইসলাম বিরোধী কুফরী মতবাদের দিকে বা পাপাচারের পথে নিয়ে যায় তবে তাদের ফতওয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না। অন্যথায় যেসব ক্ষেত্রে তারা বিদআতের প্রতি আহ্বান করে না সেসব ক্ষেত্রে তাদের ফতওয়া বৈধ হবে। খতীব বাগদাদী বলেছেন, এমন বিদআতপন্থী যাদেরকে আমরা ঐ বিদআতের কারণে কাফের বা ফাসেক ভাবি না তাদের ফতওয়া প্রদান জায়েয। তবে খারিজীদের গ্রুপ ও রাফেযী যারা সাহাবায় কিরামকে গালমন্দ করে এবং সালাফে সালেহীনদের গালি-গালাজ করে তাদের ফতওয়া বর্জনীয় ও অগ্রহণযোগ্য (আল-ফাকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ, খাতীব আল-বাগদাদী, পৃ. ২০৩; আল-মাজমু, ১/৪২)।

১৪। (ঙ) **ইজতিহাদঃ** অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়াতের হুকম বের করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা। মহান আল্লাহ বলেনঃ "বলুন, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল বিষয়সমূহ, পাপাচার, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ্র সাথে তোমাদের এমন কিছু শরীক করাকে, যার সমর্থনে তিনি কোন সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্র প্রতি তোমাদের এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না" (সূরা আরাফ ঃ ৩৩)।

ইমাম শাফিঈ (র) থেকে খতীব বাগদাদী রিওয়ায়াত করেছেন যে, ঐ ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করা বৈধ নয়, যে আল্লাহ্র কিতাবের নাসেখ ও মানসূখ, মুহকাম ও মুতাশাবিহ, তা'বীল ও তানযীল ও মাক্কী বা মাদানী হওয়া সম্পর্কে এবং সংশ্লিষ্ট আয়াত দ্বারা কি তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নয়। মুফতীকে মহানবী (স)-এর হাদীস সম্পর্কেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে যেমনিভাবে তিনি কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। আরবী ভাষা সম্পর্কেও যথেষ্ট পারদর্শী হবেন। অনুরূপভাবে আরবী সাহিত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। আর কুরআন-সুন্নাহ যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য আরো যা জানা প্রয়োজন সে বিষয়েও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবেন। এতদভিন্ন ঐ সবের প্রয়োগও সঠিকভাবে করতে হবে। তেমনিভাবে বিভিন্ন দেশের ফতওয়ার বিভিন্নতা সম্পর্কে সম্যক

জ্ঞান থাকতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজের সঠিক মতামত পেশ করবেন। যখ কোন ব্যক্তি নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করতে পারবেন তখন তার জন্য হালাল-হারাম সম্প কথা বলা বা ফতওয়া প্রদান করা জায়েয হবে। আর তিনি যদি নিজেকে এভাবে যোগ্য ক গড়ে তুলতে না পারেন তবে তার ফতওয়া দেওয়া বৈধ নয়। ইজতিহাদ করার যোগ্যত থাকার অর্থ এটাই। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে ইবনুল কায়্যিম এরূপই বর্ণন করেছেন (ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ১/৪৬)।

এ শর্তটির মর্মার্থ ঃ সাধারণ লোক তথা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও মুকাল্লিদ, যিনি অন্য মুফতী ফতওয়ার সাহায্যে ফতওয়া প্রদান করেন তাদের ফতওয়া বৈধ হবে না। ইবনুল কায়্যি মুকাল্লিদ ব্যক্তির ফতওয়া প্রদান সম্পর্কে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন ঃ

প্রথম ঃ পূর্বে যা বলা হলো। অর্থাৎ তাকলীদের দ্বারা ফতওয়া প্রদান জায়েয নয়। কার সেটাকে ইল্‌ম বলা যায় না। তদ্রূপ মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে আলেম বলা হবে না। অথচ বিন ইলমে ফতওয়া প্রদান করা হারাম। তিনি বলেন ঃ শাফিঈ ও হাম্বলী ওলামার অধিকাংশে মত এটাই।

দ্বিতীয় ঃ নিজের জন্য আমল করার ক্ষেত্রে জায়েয, কিন্তু অপরের জন্য তাক্‌লীদের মাধ্যমে ফতওয়া দেওয়া যাবে না।

তৃতীয় ঃ অতি প্রয়োজনে ও মুজতাহিদ আলেম পাওয়া না গেলে তা জায়েয হবে। তিনি বলেন, সহীহ মত এটিই এবং এ মতের উপরই আমল রয়েছে (ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ১/৪৬)

ইবনুল হুমাম থেকে ইবনে আবেদীন এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ নীতি নির্দ্ধারব ওলামার মত এটাই স্থির হয়েছে যে, মুফতী যিনি হবেন মুজতাহিদ হবেন। যিনি নিজে মুজতাহিদ নন, বরং অপর মুজতাহিদের কথা মুখস্ত করে ফতওয়া প্রদান করেন তিনি মুফতী নন। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য উচিৎ যখন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন তখন মুজতাহিদ আলেমের বরাত দিয়ে শুধু উক্ত মত বর্ণনা করা।

অতএব প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বর্তমান যমানায় যে ধরনের ফতওয়া প্রদান করা হচ্ছে ত আসলে ফতওয়া নয়, বরং তা হচ্ছে মুফতীর নকল করা কথামাত্র। যাতে ফতওয়া তলবকারী ব্যক্তি সে কথাটা গ্রহণ করে নিতে পারে। অতএব মুফতীর কর্তব্য হচ্ছে, তিনি মুজতাহিদে কথার বরাত দিয়ে বর্ণনা করবেন। বর্ণনার ভংগী যেন এমন না হয় যাতে মনে হয় যে, এটি তার নিজের কথা (হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ১/৪৭; আল-মাজমু, ১/৪৫)। তাদের একথ

বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুকাল্লিদের ফতওয়া প্রদান প্রকৃত অর্থে ফতওয়া নয়। তবে সেটাকে রূপক অর্থে ফতওয়া বলা হবে, কারণ সেটা ফতওয়া সদৃশ। আর বর্তমান যুগে মুজতাহিদগণের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার বা না থাকার দরুন এ ধরনের ফতওয়া গ্রহণযোগ্য হবে। এ কারণে তানবীরুল আবসার গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, ইজতিহাদ-ই হচ্ছে বিলায়াতের (পদাধিকারী হওয়ার) প্রধান শর্ত। ইবনে আবেদীন বলেন, এ কথার অর্থ এই যে, যখনই মুজতাহিদ পাওয়া যাবে মুফতীর পদে নিয়োজিত হওয়ার জন্য তিনিই অগ্রাধিকার লাভ করবেন (ইবনে আবেদীন, ৪/৩০৫-৩০৬; ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ১/৪৬; সিফাতুল ফাতওয়া, ইবনে হামদান, পৃ. ২৪ ও ইরশাদুল ফুহুল, পৃ. ২৯৬)।

ইবনে দাকীক আল- ঈদ বলেন ঃ মুজতাহিদ ব্যক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ফতওয়া প্রদান স্থগিত রাখা হলে মহা সমস্যায় জর্জরিত হতে হবে অথবা প্রবৃত্তির প্রতারণার মধ্যে নিমজ্জিত হতে হবে। বরং পূর্বসূরী ইমামগণের নিকট থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তি যদি নির্ভরযোগ্য হন বা ইমামের কথা বুঝতে সক্ষম হন, অতঃপর মুকাল্লিদের নিকট ইমামের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন তবে তাই যথেষ্ট হবে, এটিই পছন্দনীয়। কারণ একজন সাধারণ ব্যক্তির নিকট এ ধারণাই প্রবল হবে যে, এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। তিনি বলেনঃ এ ধরনের ফতওয়া প্রদানের উপরই বর্তমান কালে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যাাকশী বলেন ঃ যে ব্যক্তি কিছু ইলম একত্র করতে সক্ষম হয়েছে তার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে যে, তার ফতওয়া প্রদান করা বৈধ নয় (বাহরুল মুহীত, যারাকশী, ৬/৩০৬)।

১৫। কেউ যদি নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দিতে চান তবে সেটা তখনই তার জন্য বৈধ হবে যখন তিনি সংশ্লিষ্ট ফতওয়াটির দলীল ও তা বের করার কারণ খুঁজে বের করতে পারবেন।

ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মাস্‌আলায় নিজে তাকলীদ করেন, তাকলীদ করা ভিন্ন তার নিকট কোন জ্ঞান না থাকে তবে তার পক্ষে আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে ফতওয়া দেওয়া বৈধ নয়। সালাফে সালেহীন এর উপর ঐক্যমত পোষণ করেন এবং ইমাম শাফিঈ, আহমাদ প্রমুখ স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন (ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/১৯৫, ১৯৮ ও ১/৪৫; রাসমুল মুফতী, ইবনে আবেদীন, ১১ পৃ.)।

শারহুর রিসালা গ্রন্থে ইমাম জুয়ায়নী বলেনঃ কোন ব্যক্তি ইমাম শাফিঈর দলীলাদি এবং আর সব লোকের সমস্ত কথা মুখস্ত করে নিলো কিন্তু ঐ সবের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন তার পক্ষে

সম্ভব হয়নি তার জন্য ইজতিহাদ ও কিয়াস করা জায়েয নয় এবং সে ফাতওয়া প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি সে ফতওয়া প্রদান করে তবে বৈধ হবে না (বাহরুল মুহীত, যারকাশী, ৬/৩০৭)।

হানাফী ফকীগণের মতে সঠিক কথা হচ্ছে, মাযহাবের মুজতাহিদ ব্যক্তিবর্গ, যাদের অভিমতকে মাযহাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাদের জন্য মাযহাবের মূল ইমামের কথা গ্রহণ করা মোটেও জরুরী নয়। বরং তার উচিৎ দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তা করা এবং দলীলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া। আর তিনি যদি চিন্তা-ভাবনা করার মত যোগ্যতা না রাখেন তবে মাযহাবের ইমামদের ক্রম অনুযায়ী যে কোন মত গ্রহণ করবেন। যেমন ইচ্ছা তেমন গ্রহণ করা তার জন্য সঠিক হবে না (হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৪/৩০২ ও ১/৪৮)।

এভাবেই হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন যে, এ ধরনের ব্যক্তির জন্য উচিৎ হবে না কোন একটি মাসআলায় দু'টি মতের যে কোন একটিকে গ্রহণ করা। বরং এক্ষেত্রে তার কর্তব্য হবে, দু'টি মতের যেটি দলীল অথবা মাযহাবের মৌলনীতির কাছাকাছি সেটি গ্রহণ করা ও তার উপর আমল করা। ইবনে আবেদীন বলেনঃ ইবনে হাজার মাক্কী শাফিঈ স্পষ্টভাবে এ কথা বলেছেন এবং এব্যাপারে ইজমা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তার পূর্বে ইবনুস সালাহ ও আল-বাযী মালিকী এ বিষয়ে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। মুফতী যদি জানেন যে, স্বীয় মাযহাবের ইমামের মতের তুলনায় ভিন্ন মাযহাবের ইমামের মতটি অধিক যথার্থ তাহলে তিনি তদনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করতে পারবেন (শারহুল মুনতাহা, ৪/৪৫৮; ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২৩৭; উকুদু রাসমিল মুফতী, ইবনু আবেদীন, পৃ ১১; আল-মাজমু, ১/৬৮)।

নির্দিষ্ট মাযহাবের মুকাল্লিদ মুফতী দুর্বল ও অগ্রগণ্য মতের ভিত্তিতে ফতওয়া প্রদান করতে পারেন না। এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম। বরং হাসকাফী বলেছেন, অগ্রগণ্য মতের ভিত্তিতে ফতওয়া প্রদান করা মূর্খতা প্রসূত ও ইজমা ছিন্নকারী কাজ (দুররুল মুখতার, হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ১/৫১ ও ২/৬০২; দাসূকী আলা শারহিল কাবীর, ৪/১৩০ ও ১/২০; ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২১১ ও ১৭৭)।

হানাফী মাযহাবের মত হচ্ছে, মুকাল্লিদ মুফতী দুর্বল ও অগ্রগণ্য মতের ভিত্তিতে এমনকি নিজের ব্যাপারেও ফতওয়া দিতে পারবেন না। পক্ষান্তরে মালিকী মাযহাব মুকাল্লিদ মুফতীর নিজের জন্য তা জায়েয রেখেছে (ইবন আবেদীন, ১/৫১ ও হাশিয়াতু দাসূকী, ৪/১৩০)।

১৬। আমরা যেহেতু বলেছি যে, মুকাল্লিদ মুফতী মুজতাহিদের মতের ভিত্তিতে ফতওয়া দিতে

পারেন, অতএব মুজতাহিদের জিবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরও তার মতের ভিত্তিতে মুকাল্লিদ মুফতী ফতওয়া দিতে পারেন। ইমাম শাফিঈ বলেনঃ মাযহাবের প্রধানগণ মৃত্যুবরণ করলেও মাযহাব মরে না। আল-মাহসূল গ্রন্থের লেখকও একথা বলেছেন এবং এর উপর ইজমা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। কারণ মুজতাহিদ ইমাম কোন বিধান উদ্ভাবন করলে সেটা তার মতে স্থায়ী বিধান গণ্য হয়।

শাফিঈ ও হাম্বলীদের আরেকটি মত হচ্ছে ঃ এটা (মুকাল্লিদের জন্য মুজতাহিদের মৃত্যুর পর তার মতের ভিত্তিতে ফতওয়া প্রদান) জায়েয নয়। কারণ তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তার দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করতেন এবং প্রথম মত পরিহার করে নতুন হুকুম প্রদান করতেন (ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ২/২১৫, ২৬০ ও ইমাম নববীর মাজমু, ১/৫৫)।

১৭। মুজতাহিদ যেসব মত ও কথা প্রত্যাহার করেছেন, মুকাল্লিদের জন্য সেসব মতের ভিত্তিতে ফতওয়া প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা মুজতাহিদ সেগুলি প্রত্যাহার করায় বর্জনীয় হয়েছে। তবে ওলামায়ে কিরাম তার কোন বর্জনীয় মতকে প্রাধান্য দিলে স্বতন্ত্র কথা। এ জন্যই ইমাম শাফিঈর পুরাতন মতকে পরিত্যাগ করে নতুন মত গ্রহণ করা হয়েছে, কতিপয় মাসআলা ব্যতীত, যেগুলোকে আলেমগণ প্রধান্য দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন ঃ আমার পূর্বেকার মত বর্ণনা করা কারো জন্য বৈধ হবে না (বাহরুল মুহীত, ৬/৩০৪; মাজমু', ১/৬৬, ৬৮)।

১৮। স্বচ্ছ ও মান সম্মত ফতওয়া প্রদান। অর্থাৎ ফতওয়া যথেষ্টরূপে নির্ভুল এবং উদ্ভাবন (ইস্তিম্বাত) যথার্থ হতে হবে। অতএব নির্বোধ ও প্রায়ই ভুলের শিকার হয় এমন ব্যক্তির ফতওয়া প্রদান বৈধ নয়। বরং মুফতীকে অবশ্যই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও অনুষঙ্গিক লক্ষণাদির ইঙ্গিত ও নির্দেশনা অনুধাবনে এবং সঠিক বিধান নির্ণয়ে স্বভাবতই প্রখর ধীসম্পন্ন হতে হবে। ইতিপূর্বে ইমাম শাফিঈর বক্তব্যে উক্ত হয়েছে যে, মুফতীর সঠিক মতামত দানের ক্ষমতা থাকবে। ইমাম নববী বলেন ঃ অন্তরের বোধশক্তি, সুস্থ মস্তিষ্ক, চিন্তার পরিপক্কতা ও বিশুদ্ধতা এবং বিশুদ্ধ উপলব্ধি ও ইস্তিম্বাত (উদ্ভাবন) করার গুণসম্পন্ন হওয়া মুফতীর জন্য শর্ত (মাজমু শারহুল মুহায্যাব, ১/৪১)। এটা তার ফতওয়াকে দুই দিক থেকে বিশুদ্ধ করবে।

প্রথমত ঃ তিনি দলীল-প্রমাণ থেকে সঠিক হুকুম সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ জিজ্ঞাসিত ঘটনার সাথে হুকুমটির সঠিক সামঞ্জস্য বিধান করতে তিনি সক্ষম হবেন। ফলে তিনি হুকুমের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে অসতর্ক হবেন না এবং উক্ত হুকুমে যার কোন প্রভাব নেই তা থেকে তিনি বিরত থাকতে সক্ষম হবেন।

১৯। (ছ) বিচক্ষণতা ও সতর্কতা ঃ সতর্ক থাকা মুফতীর জন্য শর্ত (মাজমু, ১/৪১)। ইবনে আবেদীন বলেন ঃ মুফতীর সতর্ক থাকাকে কেউ কেউ শর্তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে এটি একটি শর্ত। মুফতীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং তাকে জানতে হবে মানুষের কূটকৌশল সম্পর্কে। কারণ কূটকৌশল করার জন্য ও মিথ্যা সাজাতে এবং বিপরীত কথা বলতে ও মিথ্যাকে সত্য বানাতে বেশ চতুর লোক পাওয়া যায় এ সমাজে। অতএব এ যুগে মুফতীকে তার অসতর্কতা বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করবে (হাশিয়া ইবনে আবেদীন , ৪/৩০১)। ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ মুফতীকে অবশ্যই মানুষের ধোঁকা ও চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে তিনি বক্র পথে চলে যাবেন এবং অপরকে বক্র পথে পরিচালিত করবেন। প্রতারণাপূর্ণ বিবৃতির কারণে মুফতী ধোঁকায় পড়েন। যেমন জাল টাকা মূর্খ লোককে ধোঁকায় ফেলে দেয়। অতএব যিনি টাকা পরখ করতে জানেন তিনি যেমন জাল টাকা ধরতে সক্ষম হন তদ্রূপ বিচক্ষণ লোক প্রতারণাপূর্ণ বিবৃতি সনাক্ত করতে সক্ষম। এমন লোকও আছে যে সুন্দর কথা ও চমক লাগিয়ে মিথ্যাকে সত্যের আকারে হাজির করে। বরং অধিক ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা তাই। সুতরাং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানতে মুফতী অপারগ হলে মযলুম যালেম সাব্যস্ত হবে, আর যালেম সাব্যস্ত হবে মযলুম (ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২২৯, ২০৫)।

এর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু বিষয় রয়েছে সে সম্পর্কে কোন কোন আলেম সতর্ক থাকতে বলেছেন। তা হচ্ছে, ফতওয়াপ্রার্থীর জন্য ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে মুফতীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, সে তার কথার উল্টো অর্থ করতে না পারে- শপথ, স্বীকারোক্তি বা অনুরূপ বিষয়ে বিশেষ করে তার ফাতওয়া হয়ে থাকলে।

২০। আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা যেন সঠিক ফতওয়া প্রদানকে প্রভাবিত না করতে পারে, যেরূপ বিচারকার্যে ও সাক্ষ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে থাকে। অতএব, মুফতী তার পিতা, পুত্র, বন্ধু, অংশীদারকে ফতওয়া প্রদান করতে অথবা দুশমনকে ফতওয়া প্রদান করতে যেন কোন বৈপরীত্যের শিকার না হন। কারণ এক্ষেত্রে ফতওয়া রিওয়ায়াত তুল্য। আর মুফতী এক্ষেত্রে শরীয়াতের সাধারণ সংবাদবাহক মাত্র, ব্যক্তিবিশেষের সংবাদের কোন বিশেষত্ব নেই। কারণ ফতওয়ার সাথে বাধ্যবাধকতা জড়িত নয়, কিন্তু বিচারকের রায়ের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

নিজের জন্যও ফতওয়া দেয়া জায়েয। ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ তবে ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের জন্য বা আত্মীয়ের জন্য অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয়। যেমন ঃ নিজের অথবা

াত্মীয়ের জন্য সহজ ফতওয়া গ্রহণ করবে আর অপরের জন্য কঠিন ফতওয়া দিবে। যদি ামন করে তবে এটা মুফতীর ন্যায়পরায়ণতাকে কলুষিত করবে। হাবী গ্রন্থের গ্রন্থকার থেকে াবু আমর ইবনুস সালাহ বর্ণনা করেছেন, যদি মুফতী তার ফতওয়ায় বিশেষ কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন তবে তিনি তার প্রতিপক্ষ বিবেচিত হবেন। ফলে তার ফতওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমনিভাবে বাদীর বিপক্ষে তার শত্রুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৪/৩০২; মাজমু, ১/৪১; শরহুল মুনতাহা, ৩/৪৭২, ৪৭৩; 'লামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২১০)।

মোম আহমাদ মুফতীর কয়েকটি পূর্ণাংগ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলেন ঃ কোন ব্যক্তি পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন না হলে তাকে ফতওয়া প্রদানের জন্য নিযুক্ত করা ঠিক নয়। (১) সহীহ নিয়াত থাকতে হবে, অন্যথ্যায় তার ব্যক্তিত্বে ও তার কথায় প্রভাব থাকবে না। (২) জ্ঞান, বিচক্ষণতা, গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব ও স্থীরতা। (৩) নিজের উপর আস্থাশীল হতে হবে। (৪) পর্যাপ্ত ইল্‌মের অধিকারী হবে, অন্যথায় লোকেরা তাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করবে। (৫) মানুষকে মূল্যায়ন ক্ষমতা থাকতে হবে।

২১। কাযীর ফতওয়া

এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই যে, ইবাদত এবং অনুরূপ বিষয়, যেমন যবেহ, কোরবানী, যার সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক নেই, সেক্ষেত্রে বিচারকের ফতওয়া প্রদান করা জায়েয। কিন্তু যেসব বিষয় বিচার কার্যের সাথে সম্পৃক্ত সে ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণ মতভেদ করেছেন। শাফিঈদের একটি মত যাকে ইমাম নববী সহীহ বলেছেন এবং হাম্বলীদের একটি মত রয়েছে যেটাকে ইবনুল কায়্যিম সঠিক বলেছেন, তা হচ্ছেঃ বিচারক নির্দ্বিধায় সে বিষয়েও ফতওয়া দিতে পারেন। তবে উভয় মাযহাবের অপর দল বলেছেন, বিচারকের জন্য বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে ফতওয়া দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ এখানে (নির্দোষীর) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা বিচারক যদি ফতওয়া দেন তবে সেটা বিচারপ্রার্থীর ক্ষেত্রে হুকুম। আর বিচার করার সময় তিনি তার বিপরীত করতে পারবেন না। আবার এও হতে পারে যে, তার দৃষ্টিভংগী বিচারের সময় পাল্টাতে পারে অথবা বিচার করার মুহূর্তে এমন ইংগীত বেরিয়ে আসতে পারে যা ফতওয়া প্রদানের সময় ছিলো না। তিনি যদি তার ফতওয়ার বিপরীত বিচার করেন তবে বিচারপ্রার্থীর জন্য তিনি ঘৃণিত হবার পথ প্রশস্ত করে দিলেন। কাযী শুরায়হ বলেন ঃ আমি তোমাদের বিচার করবো, ফতওয়া দিবো না। ইবনুল মুনযির বলেন ঃ শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কিত বিষয়ে কাযীর ফতওয়া প্রদান করা মাকরূহ

(মাজমু, ১/৪২; ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ৪/২২০; সিফাতুল মুফতী, ইবনে হামদান, পৃ. ২৯)।

হানাফী মাযহাবের সহীহ মত হচ্ছে ঃ বিচারে এজলাসসহ যে কোন স্থানে ইবাদত সংক্রান্ত বিচার সংক্রান্ত বা অন্য বিষয়ে কাযী ফতওয়া দিতে পারেন, যদি ফতওয়া তলবকারী ব্যা বিচারপ্রার্থী না হয়। তবে ফতওয়া তলবকারী বিচারপ্রার্থী হলে কাযীর ফতওয়া দেওয়া জায়ে নয় (হাশিয়া ইবনে আবেদীন ও দুররুল মুখতার, ৪/৩০২)।

মালিকীদের মত হচ্ছে ঃ যে সকল বিষয়ে কাযীর কর্তব্য হচ্ছে বিচারকার্য করা, যেম কেনা-বেচা, শুফআ ও দণ্ডনীয় অপরাধ, এসব ক্ষেত্রে ফতওয়া দেওয়া মাকরূহ।

বারযালী বলেছেন ঃ এ হুকুম তখন কার্যকর হবে যদি তার ফতওয়ার বিষয় তার বিচারকার্যে অধীন এলাকায় হয়। কিন্তু যদি তার এলাকার বাইরে থেকে ফতওয়া চাওয়া হয় তবে ত মাকরূহ নয় (শারহুল কাবীর ও হাশিয়া দাসূকী, ৪/১৩৯)।

অতঃপর কাযীর প্রদত্ত ফতওয়া ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কাযী নিকট বিচার চাওয়া যাবে। অতএব তিনি বা অন্য বিচারক যদি অপর কোন মামলার উল্টে রায় দেন তবে সে ক্ষেত্রে তার এ রায় তার হুকমের বিপরীত ধর্তব্য হবে না (ইলামু মুয়াক্কিয়ীন, ৪/২২১; হাশিয়া দাসূকী, ৪/১৫৭; ইবনে আবেদীন, ৪/৩২৬)। রমযান মাসে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে যদি এক ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে সেটা সংশ্লিষ্ট বিচারকে আদালতে তার রায়ের উপর তথা ন্যায়পরায়ণতা ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। একথ বলা যাবে না যে, তিনি মিথ্যা আরোপ করেছেন বা চাঁদ দেখেননি, কারণ মামলা ব বিচারকার্য ইবাদতের শামিল হবে না (শারহুল মুনতাহা, ৩/৫০১)।

২২। ফতওয়ার ভিত্তি কি হবে?

নির্ভরযোগ্য ক্রমানুসারে নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ব্যক্তি ফতওয়া প্রদা করবেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে ফতওয়া প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ রাসূলের হাদীস অনুযায়ী, অতঃপর (বিশেষজ্ঞ আলেমগণের) ইজমা অনুযায়ী ফতওয়া দা করবেন। কিন্তু বিতর্কিত দলীলের ক্ষেত্রে, যেমনঃ ইসতিহ্‌সান অথবা আমাদের পূর্বে নবীদের শরীয়াত, এক্ষেত্রে যদি তিনি তার ইজতিহাদে সঠিক মতে পৌঁছতে পারেন তবে তদনুযায়ী ফতওয়া দিবেন। আর যদি দলীলের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় তবে যেটা তা নিকট অগ্রগণ্য মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে ফতওয়া দিবেন।

যে কোন মুজতাহিদের মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দেওয়া তার জন্য যথার্থ হবে না যতক্ষণ ন তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, উক্ত মাযহাবের মতটিই হক

ামনিভাবে তার দৃষ্টিতে যেটি অগ্রগণ্য মনে হয় সেই মত অনুসারে ফতওয়া দেওয়াও তার ন্য বৈধ নয়। ইবনে কুদামা ও আল-বাযী এ বিষয়ে ইজমার উল্লেখ করেছেন (রাওদাতুন জের, ২/৪৩৮; আল-মুয়াফিকাত, ৪/১৪০; ইরশাদুল ফাহুল, পৃ. ২৬৭)।

ন্তু আমরা যেহেতু মুকাল্লিদ সম্পর্কে বলেছি যে, তার ফতওয়া দেওয়া জায়েয, কারণ যে জতাহিদের মতানুযায়ী ফতওয়া দেওয়া তার জন্য সহজ হয় তিনি সেটাই করবেন। জতাহিদদের মধ্যে কে উত্তম ও অধিক অভিজ্ঞ তা খোঁজ করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা তাতে যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (র)-এর মধ্যে কারো কিছু জানার য়োজন হলে যার নিকট থেকে তা জানা সহজ হতো তার কাছ থেকেই জেনে নিতেন। াবার কেউ বলেছেনঃ তিনি পর্যালোচনা করে উত্তম ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত অনুযায়ী ফতওয়া তে পারেন।

ার কোন বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ইজতিহাদে মতপার্থক্য হলে মুফতীদের কর্তব্য চ্ছে অগ্রাধিকারদানের পন্থাসমূহের মধ্যকার যে কোনো পন্থায় দু'টি মতের যে কোন কটিকে অগ্রাধিকার দেয়া। ইচ্ছামত কোনো মত গ্রহণ কিংবা পরিত্যাগ করার এখতিয়ার (এ ক্ষেত্রে) নেই।

মাম নববী বলেন ঃ কোনো মাসআলায় দুই রকম বক্তব্য থাকলে মুফতী কিংবা আমলকারী ন্তা-ভাবনা ছাড়া এবং বক্তব্য দু'টির প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ ব্যতীত যেমন খুশী তেমন ামল করতে পারবেন না। বরং দলীলের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য মতের ওপর ামল করবে (আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ১/৬৮)। আর তিনি যদি ফতওয়াকে হাদীসের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চান তাহলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান াকতে হবে। হয় তিনি নিজে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হবেন অথবা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের িকট থেকে তা জেনে নিবেন।

ার যদি মুফতী তার ফতওয়া কোন মুজতাহিদের মতের ভিত্তিতে দেন, যা তার জন্য জায়েয াহলে তা সরাসরি মুজতাহিদের মুখ থেকে শুনে এ ব্যাপারে তাকে অবশ্যই আস্থা অর্জন রতে হবে। ইবনে আবেদীন বলেন ঃ বক্তব্যটির সনদ পরম্পরা মুজতাহিদ পর্যন্ত পৌঁছতে বে অথবা এমন কিতাব থেকে তা গ্রহণ করতে হবে যা হস্ত দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি াসিদ্ধ, যেমন প্রসিদ্ধ মৌলিক রচনাবলী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কিতাবসমূহ এবং অনুরূপ। কননা এটা সুপ্রসিদ্ধ খবরে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। ঠিক একইভাবে যদি মুফতী দেখতে ান যে, ওলামায়ে কেরাম উক্ত কিতাব থেকে তথ্য নকল করছেন বা লিখে নিচ্ছেন এবং যা

নকল করছেন তা সংশ্লিষ্ট কিতাবে বিদ্যমান আছে, অনুরূপ অন্যান্য বিষয় যা দ্বারা ধারণ আরো প্রবল হয়। যেমন মুফতী দেখতে পান যে, কিতাবে কোনো কোনো আলেমের হস্তাক্ষ বিদ্যমান রয়েছে (হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৪/৩০৬; আল-মাজমূ, ১/৪৭)। তবে পরবর্ত কালের লোকদের কিতাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত (উকূদ রাসমিল মুফতী পৃ. ১৩)।

২৩। ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে ফতওয়াদান

রায় বা মত হচ্ছে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক দিক জানার বা অন্বেষণ করার পর অন্তর যে পরস্পর বিরোধী আলামতসমূহ দেখতে পায়। আলামতসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আলামত না পাওয়া গেলে তাকে রায় বলা যাবে না (ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/৬৬)। কিয়াস ইসতিহসান ইত্যাদি রায়ের অন্তর্ভুক্ত। নস অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর মূল বক্তব্য এবং কিয়াস বিরোধী মতের ভিত্তিতে ফতওয়া দেয়া জায়েয নেই। কোনো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর মূল বক্তব্য লাভের প্রচেষ্টা না চালিয়ে শুধু মতামতের উপর নির্ভর করা জায়েয নেই, কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পর্ক না রেখে কেবলমাত্র খেয়াল আর অনুমানের ভিত্তিতে মত দেয়া জায়েয নেই।

হযরত মুয়ায (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন ঃ তুমি কিভাবে ফয়সালা দিবে? মুয়ায (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক ফয়সালা দিবো। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে (সমাধান) খুঁজে না পাও, তাহলে? তিনি বলেন, তাহলে আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক। তিনি পুনরায় বলেন ঃ যদি রাসূলের সুন্নাতেও সমাধান খুঁজে না পাও তাহলে? তিনি বলেন, আমি ইজতিহাদ করে রায় দিবো। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূলের প্রেরিত প্রতিনিধিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তৌফীক দান করেছেন (তিরমিযী, ৩/৬০৭)।

হযরত উমার (রা) কাযী শুরায়হের উদ্দেশে বলেন ঃ কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবের যে বিষয়টি তোমার কাছে সুস্পষ্ট সে বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করো না। আল্লাহ্‌র কিতাবে তার সুস্পষ্ট সমাধান না পেলে সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে তার সমাধান করো। যদি সুন্নাহ্‌র মধ্যেও তার সমাধান খুঁজে না পাও তাহলে তোমার রায় বা মতামতের ব্যাপারে ইজতিহাদ করো (ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/৬৭প., ৭৯, ৮৫)।

২৪। পূর্বে প্রদত্ত ফতওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান

যদি পূর্বে প্রদত্ত ফতোয়ার ব্যাপারে মুফতীর কাছে পুনরায় ফতওয়া জানতে চাওয়া হয় তাহলে ফতওয়া ও এর দলীলাদি মুফতীর কাছে উপস্থিত থাকলে পুনর্বার ফতওয়াটির বিষয়ে

চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন নেই। কেননা মুফতীর যা জানা প্রয়োজন তা অর্জিত হয়েছে। আর ফতওয়া পুনর্বার দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুফতী যে রায় দিবেন সে ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হওয়া। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তিনি মনে করেন যে, পুনর্বার যদি দেখেন তাহলে তার ইজতিহাদ পরিবর্তিত হতে পারে (অর্থাৎ পুনর্বার দেখলে মতামত পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই কেবল ফতওয়াটি বারবার দেখার প্রয়োজন আছে, অন্যথায় প্রয়োজন নেই)।

যদি প্রথম ফতওয়াটির উল্লেখ থাকে কিন্তু দলীল উল্লেখ না থাকে এবং কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ বা কোন মতটি গ্রহণ করা উচিৎ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না দেয়া হলে একটি মত অনুযায়ী মুফতী উল্লিখিত ফতোয়া অনুযায়ী রায় দিবেন। তবে দ্বিতীয় মতে বলা হয়েছে ঃ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হচ্ছে–মুফতী নতুন করে মতামত প্রদানের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

২৫। পরস্পর বিরোধপূর্ণ ফতওয়ার ক্ষেত্রে মুফতীর এখতিয়ার

মুজতাহিদ মুফতীর দৃষ্টিতে যদি কোনো বিষয়ে দলীল-প্রমাণাদির মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় অথবা মুকাল্লিদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য একাধিক মত পরস্পর বিপরীত হয় তাহলে অধিকাংশের মতে মুফতী তার ইচ্ছামত একটিকে গ্রহণ এবং অপরটিকে বর্জন করতে পারবেন না। বরং উসূলে ফিক্হ-এর দৃষ্টিতে যে দলীল বেশী সুস্পষ্ট তার ভিত্তিতে যে কোনো উপায়ে সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য মতের দিকে তাকে ফিরে আসতে হবে।

২৬। সহজ মত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মুফতীর অনুসরণ

প্রায় সকল আলেমের মতে এবং ইমাম নববী (র) তার ফতওয়ায় যে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন তদনুযায়ী কোন মুফ্তীর বিভিন্ন মাযহাবের শুধু সহজতর মতগুলো অনুসরণ করার অধিকার নেই। দু'টি মতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজতর মত খুঁজে তদনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করা তার উচিৎ নয়। বিশেষ করে ফতওয়া যদি মুফতীর মহব্বতের কোনো ব্যক্তি, বন্ধু বা নিকটাত্মীয় হয় তাহলে সহজ মতানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করা আর তার শত্রু পক্ষের কেউ হলে ভিন্ন মতানুযায়ী ফতোয়া দেয়া উচিৎ নয়। কেউ এ রকম কাজ করলে ওলামায়ে কেরাম এটাকে তার মস্তবড় ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম শাতিবী আল-বাজী ও আল-খাত্তাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী ও ইবনুল কায়্যিম-সহ কতক আলেম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করবে সে ফাসেক, পাপাচারী। কেননা মুফতীর দৃষ্টিতে দলীলের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত